বিবিধ প্রসঙ্গ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র ১৮০৫ শক।

সূচিপত্র।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

মনের বাগান বাড়ি।

ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্র-ভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও, হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না। প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃ-

দয় মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য। অসুর আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়। যাহাকে তুমি দেবতা বলিয়া জান' তাহাকেই তুমি অমৃত দাও, যাহাকে দেবতা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাকেই অমৃত দাও। কিন্তু এমন মহাদেব সংসারে আছেন, যিনি দেবতা বটেন, কিন্তু যাঁহার ভাগ্যে অমৃত জুটে নাই, সংসারের সমস্ত বিষ তাঁহাকে পান করিতে হইয়াছে, আবার এমন রাহুও আছে যে অমৃত খাইয়া থাকে।

(যাঁহাকে তুমি ভাল বাস,' তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের সমস্তটা দেখাইও না।) যেখানে তোমার হৃদয়ের পয়ঃপ্রণালী, যেখানে আবর্জ্জনা, যেখানে জঞ্জাল, সেখানে তাঁহাকে লইয়া যাইও না; তাহা যদি পার' তবে আর তোমার কিসের ভাল বাসা! তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের এমন

অঞ্চলের ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ করিবে, যেখানে ম্যালেরিয়া নাই, ওলাউঠা নাই, বসন্ত নাই। তাঁহাকে যে বাড়ি দিবে তাহার দক্ষিণ দিকে খোলা, বাতাস আনাগোনা করে, বড় বড় ঘর, সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে। ইহা যে করে সেই যথার্থ ভালবাসে। এমন স্বার্থপর প্রণয়ী বোধ করি নাই, যে মনে করে, তাহার প্রণয়ীকে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বাঁশ ঝাড়ে ঘুরাইয়া, সমস্ত পচাপুকুরে স্নান করাইয়া না বেড়াইলে যথার্থ ভালবাসা হয় না। অনেকের মত তাহাই বটে, কিন্তু সঙ্কোচে পারিয়া উঠে না। এ বড় অপূর্ব্ব মত।

অনেকে বলিয়া উঠিবেন, "এ কি রকম কথা; যাঁহাকে তুমি খুব ভালবাস', যাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয় মনে করা যায়, তাঁহার নিকটে মনের কোন ভাগ গোপন করা কি উচিত?" উচিত নহেত কি? সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় "নিজের"

নিকটে স্বভাবতঃ অনেকটা গোপন করিতে হয়। না করিলে চলে না, না করিলে মঙ্গল নাই। প্রকৃতি যাহাদের চক্ষে পাতা দেন নাই, যাহারা আবশ্যকমত চোক বুজিতে পারে না, মনে যাহা কিছু আসে, যে অবস্থাতেই আসে, তাহাদের কুম্ভীর-চক্ষে পড়িবেই, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্দ্দশা। আমরা অনেক মনোভাব ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি না, চোক বুজিয়া যাই। এরূপ করিলে সে ভাব গুলিকে উপেক্ষা করা হয়, অনাদর করা হয়। ক্রমে তাহারা ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। এই ভাবগুলি, প্রবৃত্তিগুলি যদি ঢাকিয়া রাখা না যায়, পরস্পরের কাছে প্রকাশ করিয়া, বৈঠকখানার মধ্যে, কথাবার্ত্তার মধ্যে তাহাদের ডাকিয়া আনা হয়, তাহাদের সহিত বিশেষ চেনা-শুনা হইয়া যায়, তাহাদের কদর্য্য মূর্ত্তি এমন সহিয়া যায় যে, আর খারাপ লাগে না, সে কি

ভাল? ইহাতে কি তাহাদের অত্যন্ত আস্কারা দেওয়া হয় না? একেত যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে ভাল জিনিষ দিতে ইচ্ছা করে, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে মন্দ জিনিষ দিলে মন্দ জিনিষের দর অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া বিষ দেওয়া, রোগ দেওয়া, প্রহার দেওয়াকে কি দাতাবৃত্তি বলে?

দোকানে হাটে, রাস্তায় ঘাটে যাহাদের সঙ্গে আমাদের সচরাচর দেখাশুনা হয়, তাহাদের সঙ্গে আমাদের নানান্ কাজের সম্বন্ধ। তাহাদের সঙ্গে আমাদের নানা সাংসারিক ভাবের আদান প্রদান চলে। পরস্পরে দেখাশুনা হইলে, হয় কথাই হয় না, নয় অতি তুচ্ছ বিষয়ে কথা হয়, নয় কাজের কথা চলে। ইহারাত সাধারণ মনুষ্য। কিন্তু এমন এক এক জনকে আমার চখের সামনে আমার মনের প্রতিবেশী করিয়া রাখা উচিত, যে

আমার আদর্শ মনুষ্য। সে যে সত্যকার আদর্শ মনুষ্য এমন না হইতে পারে; তাহার মনের যতটুকু আদর্শ ভাব সেই টুকু সে আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আমার অন্য কোন কাজ কর্ম্মের সম্পর্ক নাই, কেনা বেচার সম্বন্ধ নাই, দলিল দস্তাবেজের আত্মীয়তা নাই। আমি তাহার নিকট আদর্শ সে আমার নিকট আদর্শ। আমার মনের বাগান বাড়ি তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি সে তাহার বাগানটি আমার জন্য রাখিয়াছে। এ বাগানের কাছে কদর্য্য কিছুই নাই, দুর্গন্ধ কিছুই নাই। পরস্পরের উচিত, যাহাতে নিজের নিজের বাগান পরস্পরের নিকট রমণীয় হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা। যত ফুল গাছ রোপণ করা যায়, যত কাঁটাগাছ উপড়াইয়া ফেলা হয় ততই ভাল। এত বাণিজ্য ব্যবসায় বাড়িতেছে, এত কল-কারখানা স্থাপিত হইতেছে,

যে গাছ-পালা-ফুল-ভরা হাওয়া খাইবার জমী কমিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত তোমার মনের এক অংশে গাছপালা রোপণ করিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত; যাহাতে তোমার প্রিয়তম তোমার মনের মধ্যে আসিয়া মাঝে মাঝে হাওয়া খাইয়া যাইতে পারেন। সে স্থানে অস্বাস্থ্যজনক দূষিত কিছু না থাকে যেন, যদি থাকে তাহা আবৃত করিয়া রাখিও।

সত্যকার আদর্শ লোক সংসারে পাওয়া দুঃসাধ্য। ভালবাসার একটি মহান্ গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন এক জনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে। এইরূপে সংসারে আদর্শ ভাবের চর্চ্চা হইতে থাকে। ভালবাসার খাতিরে লোককে মনের মধ্যে ফুলের গাছ রোপণ করিতে হয়, ইহাতে তাহার নিজের মনের স্বাস্থ্য সম্পাদন হয়, আর তাহার মনোবিহারী বন্ধুর স্বাস্থ্যের

পক্ষেও ইহা অত্যন্ত উপযোগী। নিজের মনের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জমীটুকু অন্যকে দেওয়ায়, ভালবাসা ছাড়া অমন আর কে করিতে পারে? তাই বলিতেছি (ভাল-বাসা অর্থে আত্ম সমর্পণ করা নহে, ভাল-বাসা অর্থে ভাল-বাসা, অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা) যাঁহাদের হৃদয় কাননের ফুল শুকাইয়াছে, ফুলগাছ মরিয়া গিয়াছে, চারিদিকে কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে, এমন সকল অনুর্ব্বর-হৃদয় বিজ্ঞ বৃদ্ধেরাই ভাল-বাসার নিন্দা করেন।

গরীব হইবার সামর্থ্য।

অনেকের গরীব-মানুষী করিবার সামর্থ্য নাই। এত তাহাদের টাকা নাই যে, গরীব-মানুষী করিয়া

উঠিতে পারে। আমার মনের এক সাধ আছে যে, এত বড় মানুষ হইতে পারি যে, অসঙ্কোচে গরীব-মানুষী করিয়া লইতে পারি! এখনো এত গরীব মানুষ আছি যে, গিল্টি-করা বোতাম পরিতে হয়, কবে এত টাকা হইবে যে, সত্যকার পিতলের বোতাম পরিতে সাহস হইবে! এখনো আমার রূপার এত অভাব যে অন্যের সম্মুখে রূপার থালায় ভাত না খাইলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। এখনো, আমার স্ত্রী কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে তাহার গায়ে আমার জমিদারীর অর্দ্ধেক আয় বাঁধিয়া দিতে হয়! আমার বিশ্বাস ছিল রাজশ্রী ক বাহাদুর খুব বড়-মানুষ লোক। সে দিন তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলাম দেখিলাম, তিনি নিজে গদীর উপরে বসেন ও অভ্যাগতদিগকে নীচে বসান, তখন জানিতে পারিলাম যে তাঁহার গরীব-মানুষী করি-

বার মত সম্পত্তি নাই। এখন আমাকে যেই বলে যে, ক রায়বাহাদুর মস্ত বড় মানুষ লোক, আমি তাহাকেই বলি, "সে কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে তিনি গদীর উপর বসেন কেন?" উপার্জ্জন করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, অনেক টাকা করিয়াছি, কিন্তু এখনো এত বড় মানুষ হইতে পারিলাম না যে, আমি যে বড় মানুষ এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারিলাম। সর্ব্বদাই মনে হয়, আমি বড় মানুষ। কাজেই আংটি পরিতে হয়, কেহ যদি আমাকে রাজাবাহাদুর না বলিয়া বাবু বলে, তবেই চোক রাঙাইয়া উঠিতে হয়। যে ব্যক্তি অতি সহজে খাবার হজম করিয়া ফেলিতে পারে, যাহার জীর্ণ খাদ্য অতি নিঃশব্দে নিরুপদ্রবে শরীরের রক্ত নির্ম্মাণ করে, সে ব্যক্তির চব্বিশ ঘণ্টা, আহার করিয়াছি বলিয়া একটা চেতনা থাকে না। কিন্তু যে হজম

করিতে পারে না, যাহার পেট ভার হইয়া থাকে পেট কামড়াইতে থাকে, সে প্রতি মুহূর্ত্তে জানিতে পারে যে, হাঁ আহার করিয়াছি বটে। অনেকের টাকা আছে বটে, কিন্তু নিঃশব্দে টাকা হজম করিতে পারে না; পরিপাক শক্তি নাই, ইহাদের কি আর বড় মানুষ বলে! ইহাদের বড়মানুষী করিবার প্রতিভা নাই। ইহারা ঘরে ছবি টাঙ্গায় পরকে দেখাইবার জন্য, শিল্প-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য ঘরটাকে একেবারে ছবির দোকান করিয়া তুলে। ইহারা গণ্ডা গণ্ডা গাহিয়ে বাজিয়ে নিযুক্ত রাখে, পাড়া প্রতিবেশীদের কানে তালা লাগাইয়া দেয়, অথচ যথার্থ গান বাজনা উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই। এই সকল চিনির বলদ্ দিগকে প্রকৃতি গরীব মনুষ্য করিয়া গড়িয়াছেন। কেবল কতকগুলা জমিদারী ও টাকার থলিতে বেচারাদিগকে বড়-মানুষ করিবে কি করিয়া?

কিন্তু-ওয়ালা।

বড় মানুষীর কথা হইতে আরেক কথা মনে পড়িয়াছে। যে ব্যক্তি স্বভাবত বড়মানুষ সেই ব্যক্তি যে বিনয়ী হইয়া থাকে একথা পুরাণো হইয়া গিয়াছে। কালিদাস বলিয়াছেন, অনেক জল থাকিলে মেঘ নামিয়া আসে, অনেক ফল ফলিলে গাছ নুইয়া পড়ে। গল্প আছে, নিউটন বলিয়াছেন, তিনি জ্ঞান সমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়াইয়াছেন। নিউটন না কি বিশেষ বড়মানুষ লোক, তিনি ছাড়া একথা যে সে লোকের মুখে আসিত না, গলায় বাঁধিয়া যাইত। অতএব দেখা যাইতেছে যাহারা স্বভাবতঃ গরীব, প্রায় তাহারা অহঙ্কারী হইয়া থাকে। ইহাও সহ্য হয়, কিন্তু এমন গরীবও আছে, যাহারা প্রাণ খুলিয়া পরের প্রশংসা করিতে পারে না।

প্রকৃতি সে ক্ষমতা তাহাদের দেন নাই। এমন লোক সংসারে পদে পদে দেখা যায়। এরূপ স্বভাব কাহাদের হয়? সকলে যদি তন্ন তন্ন করিয়া, অনুসন্ধান করিয়া দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন—যাহারা স্বাভাবিক অহঙ্কারী অথচ নিজের এমন কিছু নাই যাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারে, তাহারাই এইরূপ করিয়া থাকে। একটা ভাল কবিতা পুস্তক দেখিয়াই তাহাদের মনে হয়, আমিও এইরূপ লিখিতে পারি, অথচ তাহারা কোন জন্মে কবিতা লিখে নাই। অহঙ্কার করিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছে না, অথচ প্রশংসা করাও দায় হইয়া পড়িয়াছে। সে বলিতে চায়, এ কবিতাটি বেশ হইয়াছে, কিন্তু ইহার চেয়েও ভাল কবিতা একটি আছে, অর্থাৎ সে কবিতাটি এখনো লেখা হয় নাই, কিন্তু লেখা যাইতেও পারে। ভাল কবিতাটি বাহির করিতে

পারে না না কি, সেই জন্য তাহার গায়ের জ্বালা ধরে। সুতরাং প্রশংসার মধ্যে একটা হুল-বিশিষ্ট "কিন্তু"-র কীট না রাখিয়া থাকিতে পারে না। একটা যে বিকটাকার "কিন্তু" রাহু তাহার সকল প্রশংসাই গ্রাস করিয়া থাকে, সে রাহুটি আর কেহ নহে, সে তাহার অঙ্গহীন "আমি," তাহার অপরিতৃপ্ত ক্ষুধিত অহঙ্কার। সে দৈত্য, তাহার প্রশংসা-সুধা খাইবার অধিকার নাই, এই জন্য সকল সুধাকর চাঁদকে মলিন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার নিজের জ্ঞান আছে সে একটা মস্ত লোক, অথচ প্রমাণ দিয়া অপরকে তাহা বুঝাইতে পারিতেছে না, সুতরাং সে সকলের যশকেই অসম্পূর্ণ রাখিয়া দেয়। সে মনে করে, আমার ভাবী যশের জন্য, অথবা ন্যায্য যশের জন্য অনেকটা জায়গা করিয়া রাখা উচিত। আমি ত নিজে কোন যশের কাজ

করিতে পারি নাই, অন্যের কোন কাজকেই যখন খাতিরেই আনি না, তখন লোকদের বুঝা উচিত যে, হাতে-কলমে যদি কাজে প্রবৃত্ত হই তবে না জানি কি কারখানাই হয়। সে মনে করে যে, সেই ভাবী সম্ভাবিত যশের জন্য একটা সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত, অন্যান্য সকলের যশের রত্নগুলি ভাঙ্গিয়া এই সিংহাসনটী প্রস্তুত করা আবশ্যক। "কিন্তু" নামক অস্ত্র দিয়া সকলের যশ হইতে রত্নগুলি ভাঙ্গিয়া ইহারা রাখিয়া দেয়। আহা, এ বেচারীরা কি অসুখী! ইহাদের এ রোগ নিবারণ হয়, যদি সত্য সত্য ন্যায্য উপায়ে ইহারা যশ উপার্জ্জন করিতে পারে। ইহাদের এমন স্বভাব নাই যে, পরের প্রশংসা করিতে পারে, এমন শিক্ষা নাই যে, পরের প্রশংসা করিতে পারে, এমন সম্বল নাই যে, পরের প্রশংসা করিতে পারে; যে দিকে চাহি সেই

দিকেই দারিদ্র্য। অনেক বড় মানুষ অহঙ্কারী আছে, যাহাদের পরের প্রশংসা করিবার মত সম্বল আছে; কিন্তু এমন হতভাগা দরিদ্র অহঙ্কারী আছে যে নিজের অহঙ্কার করিতেও পারে না আবার পরের প্রশংসা করিতেও পারে না। ইহাদের "কিন্তু"-পীড়িত প্রশংসাতে কেহ যেন ব্যথিত না হন, কারণ ইহাতে তাহাদেরই দারিদ্র্য প্রকাশ করে। এই 'কিন্তু' গুলি তাহাদেরই ভিক্ষার ঝুলি। বেচারী যশ উপার্জন করিতে পারে নাই, এই নিমিত্ত তোমার উপার্জ্জিত যশ হইতে কিছু অংশ চায় তাই 'কিন্তু'-র ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়াছে।

দয়ালু মাংসাশী।

বাঙ্গালীদের মাংস খাওয়ার পক্ষে অনেকগুলি যুক্তি আছে, তাহা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমার বিশ্বজনীন প্রেম, সকলের প্রতি দয়া, এত প্রবল যে, আমি মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য কাজ মনে করি। আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের এই অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব পূর্ণ-আত্মার মধ্যে লীন করিয়া দেওয়াই সাধনার চরম ফল! পূর্ণতর জীবের মধ্যে অপূর্ণতর জীবের নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রার্থণীয় নহে ত কি? একটা পশুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে যে, সে মানুষ হইয়া গেল; মানুষের জীবনী-শক্তিতে অভাব পড়িলে একটা পশু তাহা পূরণ করিতে পারিল; মানুষের দেহের

মধ্যে প্রবেশ করিয়া মিলাইয়া গিয়া মানুষের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, সুখ, স্বাস্থ্য, উদ্যম, তেজ নির্ম্মাণ করিতে পারিল, ইহা কি তাহার সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয়! প্রথমতঃ সে নিজে স্বপ্নের অগোচর সম্পূর্ণতা লাভ করিল, দ্বিতীয়তঃ মানুষের মত একটা উন্নত জীবকে সম্পূর্ণতর করিল। ছাগলদের মধ্যে এমন দার্শনিক কি আজ পর্য্যন্ত কেহ জন্মায় নাই, যে তাহার লম্বা দাড়ি নাড়িয়া সমবেত শিষ্য-শিশুবর্গকে এই নির্ব্বাণ-মুক্তির সম্বন্ধে ভ্যাকরণ-শুদ্ধ উপদেশ দেয়! আহা, যদি কেহ এমন ছাগ-হিতৈষী জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার নিকট আমার ঠিকানাটা পাঠাইয়া দিই, এবং সেই সঙ্গে লিখিয়া দিই যে, জ্ঞানালোকিত ইয়ং-ছাগদের মধ্যে যাঁহার মুক্তিকামনা আছে, তিনি উক্ত ঠিকানায় আগমন করিলে সদয়-হৃদয় উপস্থিত লেখক

মহাশয় তাঁহাকে মুক্তি দান পূর্ব্বক বাধিত করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহা হউক, পশুদের উপকার করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য হইলেও দয়ার্দ্র-চিত্ত লোকদের মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদের মত এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজত্ব অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া যদি ইংরাজদের মধ্যে একেবারে লীন হইয়া যাইতে পারে, তবে সুখের বিষয় হয়।

বিখ্যাত ইংরাজ কবি বলিয়াছেন, যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাই, যেমন ছাগল, ভেড়া, গরু। অধিক উদাহরণের আবশ্যক নাই—মুসলমানেরা আমাদের খাইয়াছেন, ইংরাজেরা আমাদের খাইতেছেন। যদি প্রমাণ হইল যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাইয়া থাকি, তবে দেখা যাক্, বোকা জানো-

য়ারেরা কি খায়। তাহারা উদ্ভিজ্জ খায়। অতএব উদ্ভিজ্জ যাহারা খায় তাহারা বোকা। এমন দ্রব্য খাইবার আবশ্যক? নির্ব্বোধদের আমরা, গাধা, গরু, মেড়া, হস্তিমূর্খ কহিয়া থাকি। কখনো বিড়াল, ভল্লুক, সিংহ, বা ব্যাঘ্র-মূর্খ বলি না। উদ্ভিজ্জ-ভোজীদের এমন নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে, যে, বুদ্ধির যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিলেও তাহাদের দুর্ণাম ঘুচে না। নহিলে "বাঁদর" বলিয়া সম্ভাষণ করিলে লোকে কেন মনে করে, তাহাকে নির্ব্বোধ বলা হইল? পশুদের মধ্যে বানরের বুদ্ধির অভাব বিশেষ লক্ষিত হয় নাই, তাহার একমাত্র অপরাধ সে বেচারী উদ্ভিদভোজী। অতএব অনর্থক এমন একটা দুর্ণাম-ভাজন হইয়া থাকিবার আবশ্যক কি? আর একটা কথা;—উদ্ভিদ-ভোজী ভারত-র্ষকে ইংরাজ-শ্বাপদেরা দিব্য হজম করিতে

পারিয়াছেন; কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন, ভাল হজম হইল না; পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী জুলুভূমি ও ট্রান্সবাল পেটে মূলেই সহিল না, আহার করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া মাঝের হইতে বলহানী হইল, রোগ হইবার উপক্রম হইল। অতএব মাংসাশী প্রাণীর লোভ এড়াইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে মাংসাশী হওয়া আবশ্যক। নহিলে স্বাতন্ত্র বিসর্জ্জন করিয়া পরের দেহের রক্ত নির্ম্মাণ করাই আমাদের চরম সিদ্ধি হইবে। মাংস খাইবার এক আপত্তি আছে যে, শাস্ত্রে মাংসকে অপবিত্র বলে। কিন্তু সে কোন কাজের কথাই নহে। শাস্ত্রেই আছে, মেদিনী মাংসেই নির্ম্মিত। আমরা মাংসের উপরেই বাস করি। এ মাংসের পৃথিবীতে মাংসেরই জয়।

অনধিকার।

পূর্ব্বকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার অধিকার মধ্যে বাস করিতে পারিবেন না।" মহাত্মা জনক এইরূপ আজ্ঞা করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ, কোন্ কোন্ স্থানে আপনার অধিকার আছে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন; আমি অবিলম্বেই আপনার বাক্যানুসারে সেই সমুদয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিব।" ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, মহারাজ জনক তাহা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে

সমাক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে, ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! যদিও এই পুরুষ-পরম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত রহিয়াছে, তথাপি আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদয় পৃথিবীতে তৎপরে একমাত্র মিথিলা নগরীতে, ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলী মধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রতীত হইল না।

কালীসিংহের অনুবাদিত মহাভারত। আশ্বমেধিক পর্ব্ব। অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়।
দ্বাত্রিংশতম অধ্যায়। ৪২ পৃঃ

জনক রাজার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যাহা কিছুকে আমরা আমার বলি, তাহার কিছুই আমার

নয়। আমার সহিত তাহাদের ন্যূনাধিক সম্বন্ধ আছে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু তাহাদের প্রতি আমার কিছু মাত্র অধিকার নাই। আমরা ষষ্ঠীকে যে, সম্বন্ধ কারক বলি; তাহা অতি যথার্থ, কিন্তু ইংরাজেরা যে তাহাকে Possesive case বলে তাহা অতি ভুল। মানুষের ব্যাকরণে সম্বন্ধ কারক আছে কিন্তু Possesive case নাই। একটি পরমাণুও আমরা সম্পূর্ণ ভোগ করিতে পারি না, সম্পূর্ণ জানিতে পারি না, ধ্বংশ করিতে পারি না, নিয়মিত কালের অধিক রাখিতে পারি না। এমন কি, আমাদের শরীর ও মনের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের অধিকার নাই। আমরা নিতান্ত দরিদ্র, একটি ধনীর প্রাসাদে বাস করিতেছি। তিনি আমাদিগকে তাঁহার কতকগুলি গৃহসজ্জা ব্যবহার করিতে দিয়াছেন মাত্র। একটি মন দিয়াছেন,

একটি শরীর দিয়াছেন আরো কতকগুলি ব্যবহার্য্য পদার্থ দিয়াছেন। তাহার একটিকেও আমরা ভাঙ্গিতে পারি না, স্থানান্তর করিতে পারি না। যদি তাহা করিতে চেষ্টা করি, তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যদি কখনো ভ্রম-ক্রমে আমরা মনে করি—আমার শরীর আমার, ও সেই মনে করিয়া, তাহার প্রতি যথেচ্ছাচার করি, তৎক্ষণাৎ রোগ আসিয়া তাহার শাস্তি দেয়। এই জন্যই আমার শরীরকে পরের শরীরের মত অতি সন্তর্পনে রাখিতে হয়, যেন কে তাহা আমার জিম্মায় রাখিয়াছে; সর্ব্বদা সশঙ্কিত, পাছে তাহাতে আঘাত লাগে, পাছে তাহাতে আঁচড় পড়ে, পাছে তাহা মলিন হয়। মনকে যদি তুমি মনে কর আমার ও তাহার প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার কর, তবে চিরজীবন মনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এই জন্য আমরা মনকে অতি সাব-

ধানে রাখি, একটি কঠোর হস্ত তাহাকে ছুঁইবা-মাত্র আমরা সশঙ্কিত হইয়া উঠি। মন যদি আমার নয়, শরীর যদি আমার নয়, ত কে আমার?

অধিকার।

জনক রাজা কহিলেন এক্ষণে আমার মোহ নির্ম্মুক্ত হওয়াতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা আমি সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী। আমার আত্মাও আমার নহে; অথবা সমুদয় পৃথিবীই আমার। ফলতঃ ইহলোকে সকল বস্তু-তেই সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে।”

মহাভারত। আশ্বমেধিক পর্ব্ব। অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়। দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৪৩ পৃঃ।

জনক রাজার উপরিউক্ত উক্তি লইয়া একটা তর্ক উপস্থিত হইল, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

আমি। যাহা কিছু আমি দেখিতে পাই, সকলি আমার।

তুমি। সে কি রকম কথা?

আমি। নহেত কি? যে গুণে তুমি একটা পদার্থকে আমার বল, সে গুণটি কি?

তুমি। অন্য সকলে যে পদার্থকে উপভোগ করিতে পায় না, অথবা আংশিক ভাবে পায়, আমিই কেবল যাহাকে সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতে পাই তাহাই আমার।

আমি। পৃথিবীতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি? কোনটার ঘ্রাণ, কোনটার শব্দ, কোনটার স্বাদ, কোনটার দৃশ্য কোনটার স্পর্শ আমরা ভোগ করি, অথবা একাধারে ইহাদের দুই তিন-

টাও ভোগ করিতে পারি। কিম্বা হয়ত ইহাদের সকলগুলিকেই এক পদার্থের মধ্যে পাইলাম, কিন্তু তবু তাহাকে সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি কই? জগতে আমরা কিছুই সর্ব্বতোভাবে জানি না, একটি তৃণকেও না,—তবে সর্ব্বতোভাবে ভোগ করিব কি করিয়া? কে বলিতে পারে আমাদের যদি আর একটি ইন্দ্রিয় থাকিত তবে এই তৃণটির মধ্যে দৃষ্টি, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ব্যতীতও আরো অনেক উপভোগ্য গুণ দেখিতে না পাইতাম?

তুমি। তুমি অত সূক্ষ্মে গেলে চলিবে কেন? "সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করার' অর্থ এই যে, মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব, ততদূর উপভোগ করা।

আমি। এস্থলে তুমি উপভোগ শব্দ ব্যবহার করিয়া অতিশয় ভ্রমাত্মক কথা কহিতেছ।

প্রচলিত ভাষায় স্বত্ব থাকা ও উপভোগ করা উভয়ের এক অর্থ নহে। মনে কর, এক জন হতভাগ্য নিজে ভাঙ্গা ঘরে কুশ্রী পদার্থের মধ্যে বাস করে ও গৌরাঙ্গ প্রভুদের জন্য একটি অট্টালিকা ভাল ভাল ছবি, রঙ্গীন কার্পেট ও ঝাড় লণ্ঠন দিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, সে অট্টালিকা সে ছবি সে উপভোগ করে না বলিয়াই কি তাহা তাহার নহে?

তুমি। উপভোগ করে না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে।

আমি। সে কথা নিতান্তই ভুল, যদি সে কোন অবস্থায় ছবি উপভোগ করিতে পারিত তবে তাহা নিজের ঘরেই টাঙ্গাইত। মূর্খ একটি বই কিনিয়া কোন মতেই তাহা বুঝিতে না পারুক, তথাপি সে বইটিকে আপনার বলিতে সে ছাড়িবে না।

তুমি। আচ্ছা, উপভোগ করা চুলায় যাউক। যে বস্তুর উপর সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষা তোমার অধিক ক্ষমতা খাটে। যে বইটিকে তুমি ইচ্ছা করিলে অবাধে পোড়াইতে পার, রাখিতে পার, দান করিতে পার, অন্যের হাত হইতে কাড়িয়া লইতে পার তাহাতেই তোমার অধিকার আছে।

আমি। তবুও কথাটা ঠিক হইল না। শারীরিক ক্ষমতাকেইত ক্ষমতা বলে না। মানসিক ক্ষমতা তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীস্থ। তাহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ভ্রম সহজেই দেখিতে পাইবে। তুমি অরসিক, তোমার বাগানের গাছ হইতে একটি গোলাব ফুল তুলিয়াছ, তোমার হাতে সেটি রহিয়াছে, আমি দূর হইতে দেখিতেছি। তুমি ইচ্ছা করিলে সে গোলাপটি ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিতে পার, সে

ক্ষমতা তোমার আছে, কিন্তু সে গোলাপটির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই, ইচ্ছা করিলে আর সব করিতে পার, কিন্তু মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে উপভোগ করিতে পার না; আর, আমি তাহাকে ছিঁড়িতে পারি না বটে, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি। তাহার গোলাব ছিঁড়িবার ক্ষমতা আছে, আমার গোলাপ উপ-ভোগ করিবার ক্ষমতা আছে, কোন্ ক্ষমতাটি গুরুতর? তবে কেন সে তাহাকে "আমার গোলাপ" বলে, আর আমি পারি না? গোলাপ সম্বন্ধে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা, আমার তাহা আছে, তবু সে গোলাবের অধিকারী আমি নহি। এস্থলে দেখা যাইতেছে, যে বলদ চিনি বহন করিয়া থাকে, প্রচলিত ভাষায় তাহাকেই চিনির অধিকারী কহে। আর যে মানুষ ইচ্ছা

করিলেই সে চিনি খাইতে পারে, সে মানুষের সে চিনিতে অধিকার নাই।

তুমি হয়ত বলিবে যাহার উপর আমাদের শারীরিক ক্ষমতা খাটে, চলিত ভাষায় তাহাকেই "আমার" কহে। তাহাও ঠিক নহে, যাহার সহিত আমার হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ আছে তাহাকেও ত আমি "আমার" কহি।

তুমি। আচ্ছা, আমি হার মানিলাম। কিন্তু তুমি কি সিদ্ধান্ত করিলে শুনি।

আমি। যে কোন পদার্থ আমরা দেখি, শুনি, ইন্দ্রিয় বা হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করি, তাহাই আমাদের। তুমি যে ফুলকে "আমার" বল, তুমি তাহাকে দেখিতে পার, স্পর্শ করিতে পার, ঘ্রাণ করিতে পাও, আমি আর কিছু পাই না, কিন্তু যদি তাহাকে দেখিতে পাই, তবে সে মুহূর্ত্তেই তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ বাধিয়া

গেল, সে সম্বন্ধ হইতে কেহ আমাকে আর বঞ্চিত করিতে পারিবে না। তুমিও তাহার সব পাও নি, আমিও তাহার সব পাইনি, কারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব; তুমিও তাহার কিছু পাইলে, আমিও তাহার কিছু পাইলাম, অতএব তোমারও সে, আমারও সে। এই জন্যই জনক কহিয়াছিলেন, "কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী আমি। ফলত ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে।" সন্ধ্যা বা উষাকে কেহ আমার সন্ধ্যা আমার উষা বলে না কেন? যদি বল, তাহার কারণ, তাহারা সকল মানুষের পক্ষেই সমান, তাহা হইলে ভুল বলা হয়। আমি সন্ধ্যাকে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক উপভোগ করি, অতএব সেই উপভোগ-ক্ষমতার বলে তোমাদের কাছ হইতে সন্ধ্যার দখলি-স্বত্ব

কাড়িয়া লইয়া সন্ধ্যাকে বিশেষ করিয়া আমার সন্ধ্যা বলি না কেন? তাহার কারণ আমি সন্ধ্যাকে সর্ব্বপ্রকারে অধিক উপভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের কাছ হইতে সে ত একেবারে ঢাকা পড়ে নাই। এইরূপে একটা পদার্থকে কেহ বা কিছু উপভোগ করে, কেহ বা অধিক উপভোগ করে, কিন্তু সে পদার্থটা তাহাদের উভয়েরই।

আত্মীয়ের বেড়া।

একলা একজন মাত্র লোক কিছুই নহে। সে ব্যক্তিই নহে। সে, সাধারণ মনুষ্য সমাজের সম্পত্তি। শ্যামের সঙ্গেও তাহার যে সম্পর্ক, রামের সঙ্গেও তাহার সেই সম্পর্ক। সে সরকারী। সে অমিশ্র জলজনন বাষ্পের মত। যতক্ষণ জলজনন বাষ্প অমিশ্র ভাবে থাকে, তত-

ক্ষণ বায়ুর সঙ্গেও তাহার যে সম্পর্ক, জলের সঙ্গেও তাহার সেই সম্পর্ক। অবশেষে আর গুটি দুই তিন বাষ্প আসিয়া যখন তাহার সঙ্গে মেলে, তখন আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি, সে জল কি বায়ু। তেমনি একক আমার সহিত যখন আর গুটি দুই তিন ব্যক্তি আসিয়া জমা হয়, তখন আমি ব্যক্তিবিশেষ হইয়া দাঁড়াই। আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয়গণ আমার সীমা। সাধারণ মনুষ্যদের হইতে আমাকে পৃথক করিয়া রাখা, আমাকে ব্যক্তিবিশেষ করিয়া রাখাই তাঁহাদের কাজ। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের চারিদিকে কতকগুলি বিশেষ পরের আবশ্যক, সাধারণ পর হইতে. তাহারা আমাদিগকে পর করিয়া রাখে। কতকগুলি পরকে আপনার করিতে না পারিলে আমি "আপনি" হইতে পারি না; "পর" দিয়া "আপনি"-কে গড়িয়া তুলিতে

হয়। নহিলে আমি মানুষ হই, ব্যক্তি হই না। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব নামক কতকগুলি পর আছেন, তাঁহারা পরকে পর করেন, আপনাকে আপনি রাখেন। আমাদের কেহই যদি আত্মীয় না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের পরইবা কে থাকিত? তাহা হইলে সকলেরই সঙ্গে আমার সমান সম্পর্ক থাকিত। রেখাব নামক একটি স্থুর যতক্ষণ স্বতন্ত্র থাকে ততক্ষণ সে বেহাগেরও যেমন সম্পত্তি, কানেড়ারও তেমনি সম্পত্তি, ও অমন শত সহস্র রাগিণীর সঙ্গে তাহার সমান যোগ। কিন্তু যেই তার চতুস্পার্শে আর কতকগুলি স্থুর আসিয়া একত্র হয়, তখনি সে বিশেষ রাগিণী হইয়া দাঁড়ায় ও অবশিষ্ট সমুদায় রাগিণীকে পর বলিয়া গণ্য করে। তেমনি আমরা যে, সকলে রেখাব গান্ধার প্রভৃতি একেকটি স্থুর না হইয়া বেহাগ ভৈরবী প্রভৃতি একেকটি রাগিণী

হইয়াছি, তাহা কেবল আমাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের প্রসাদে। আমরা যে একলা থাকিতে পাই, বিরলে থাকিতে পারি, তাহার কারণ আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয়গণ আমাদিগকে চারিদিকে ঘেরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া। নতুবা আমরা মুক্ত জগতে লক্ষ লোকের মধ্যে গিয়া পড়িতাম, শত সহস্রের কোলাহলের মধ্যে আমাদিগকে বাস করিতে হইত। অতএব কতকগুলি লোক ঘনিষ্ঠ ভাবে আমাদের কাছাকাছি না থাকিলে আমরা একলা থাকিতে পাই না, বিরলে থাকিতে পারি না। আকারহীন, ভাষাহীন, অন্তঃপুরহীন, কুহেলিকাময় কতকগুলা অপরিস্ফুট ভাবের দল আমাদের মনের মধ্যে যেমন ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া আনাগোনা করে, পরস্পরের কোলাহলে পরস্পরে মিশাইয়া থাকে, সমাজের মধ্যে আমরা তেমনি থাকি। অবশেষে সে ভাব গুলিকে যখন

বিযুক্ত করিয়া লইয়া তাহাদিগকে আকার দিয়া, ভাষাবদ্ধ করিয়া, তাহাদের জন্য এক একটা স্বতন্ত্র অন্তঃপুর স্থাপন করিয়া দিই, তখন তাহারা যেমন বিরলে থাকে, একক হইয়া যায়, আমরাও সংসারী হইয়া তেমনি হই।

বেশী দেখা ও কম দেখা।

সাধারণের কাছে প্রেমের অন্ধ বলিয়া একটা বদ্‌নাম আছে। কিন্তু অনুরাগ অন্ধ না বিরাগ অন্ধ? প্রেমের চক্ষে দেখার অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিয়া দেখা। তবে কি বলিতে চাও, যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখে, সে কিছুই দেখিতে পায় না? যে প্রতি কটাক্ষ দেখে, প্রতি ইঙ্গিত দেখে, প্রতি কথা শোনে, প্রতি নীরবতা শোনে, সে মানুষ

চিনিতে পারে না? যে ভাবুক কবিতা ভালবাসে সে কবিতা বুঝিতে পারে না? যে কবি প্রকৃতিকে প্রেমের চক্ষে দেখে সে প্রকৃতিকে দেখিতে পায় না? বিজ্ঞানবিৎ কি কেবল দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণের সাহায্যেই বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করেন, তাঁহার কাছে যে অনুরাগবীক্ষণ আছে, তাহা কি কেহ হিসাবের মধ্যে আনিবেন না? তুমি বলিবে প্রেম যদি অন্ধ না হইবে তবে কেন সে দোষ দেখিতে পায় না? দোষ দেখিতে পায় না যে তাহা নহে। দোষকে দোষ বলিয়া মনে করে না। তাহার কারণ সে এত অধিক দেখে যে দোষের চারিদিক দেখিতে পায়, দোষের ইতিহাস পড়িতে পারে। একটা দোষবিশেষকে মনুষ্য-প্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া লইয়া দেখিলে তাহাকে যতটা কালো দেখায়, তাহার স্বস্থানে রাখিয়া তাহার আদ্যন্তমধ্য দেখিলে তাহাকে

ততটা কালো দেখায় না। আমরা যাহাকে ভাল বাসিনা তাহার দোষটুকুই দেখি, আর কিছু দেখিনা। দেখিনা যে মনুষ্য প্রকৃতিতে সে দোষ সম্ভব, অবস্থাবিশেষে সে দোষ অবশ্যম্ভাবী ও সে দোষ সত্ত্বেও তাহার অন্যান্য এমন গুণ আছে, যাহাতে তাহাকে ভাল বাসা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বিরাগে আমরা যতটুকু দেখিতে পাই, অনুরাগে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক দেখি। অনুরাগে আমরা দোষ দেখি, আবার সেই সঙ্গে তাহা মার্জ্জনা করিবার কারণ দেখিতে পাই। বিরাগে কেবল দোষ মাত্রই দেখি। তাহার কারণ বিরাগের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, তাহার একটা মাত্র চক্ষু। আমাদের উচিত ভালবাসার পাত্রের দোষ গুণ আমরা যে নজরে দেখি, অন্যদের দোষ গুণও সেই নজরে দেখি। কারণ, ভালবাসার পাত্রদেরই আমরা

যথার্থ বুঝি। যাঁহাদের ভালবাসা প্রশস্ত, হৃদয় উদার, বসুধৈব কুটুম্বকং তাঁহারা সকলকেই মার্জ্জনা করিতে পারেন। তাহার কারণ, তাঁহারাই যথার্থ মানুষদের বুঝেন, কাহাকেও ভুল বুঝেন না। তাঁহাদের প্রেমের চক্ষু বিকশিত, এবং প্রেমের চক্ষুতে কখনো নিমেষ পড়ে না। তাঁহারা মানুষকে মানুষ বলিয়া জানেন। শিশুর পদস্খলন হইলে তাহাকে যেমন কোলে করিয়া উঠাইয়া লন, আত্ম সংযমনে অক্ষম একটি দুর্ব্বল হৃদয় ভূপতিত হইলে তাহাকেও তেমনি তাঁহাদের বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে উঠাইতে চেষ্টা করেন। দুর্ব্বলতাকে তাঁহারা দয়া করেন, ঘৃণা করেন না।

বসন্ত ও বর্ষা।

এক বিরহিনী আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, বিরহের পক্ষে বসন্ত গুরুতর কি বর্ষা গুরুতর ? এ বিষয়ে তিনি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা ঢের ভাল বুঝেন। তবে উভয় ঋতুর অবস্থা আলোচনা করিয়া যুক্তির সাহায্যে আমরা একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া লইয়াছি। মহাকবি কালিদাস দেশান্তরিত যক্ষকে বর্ষাকালেই বিরহে ফেলিয়াছেন। মেঘকে দূত করিবেন বলিয়াই যে এমন কাজ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। বসন্ত কালেও দূতের অভাব নাই। বাতাসকেও দূত করিতে পারিতেন। একটা বিশেষ কারণ থাকাই সম্ভব।

বসন্ত উদাসীন, গৃহত্যাগী। বর্ষা সংসারী, গৃহী। বসন্ত আমাদের মনকে চারদিকে বিক্ষিপ্ত

করিয়া দেয়, বর্ষা তাহাকে এক স্থানে ঘনীভূত করিয়া রাখে। বসন্তে আমাদের মন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যায়, বাতাসের উপর ভাসিতে থাকে, ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে; আমাদের মন বাতাসের মত, ফুলের গন্ধের মত, জ্যোৎস্নার মত লঘু হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বসন্তে বহির্জগত গৃহ-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের মনকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। বর্ষায় আমাদের মনের চারিদিকে বৃষ্টিজলের যবনিকা টানিয়া দেয়, মাথার উপরে মেঘের চাঁদোয়া খাটাইয়া দেয়। মন চারিদিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই যবনিকার মধ্যে এই চাঁদোয়ার তলে একত্র হয়। পাখীর গানে আমাদের মন উড়াইয়া লইয়া যায়, কিন্তু বর্ষার বজ্র-সঙ্গীতে আমাদের মনকে মনের মধ্যে স্তম্ভিত করিয়া রাখে।

পাখীর গানের মত এ গান লঘু, তরঙ্গময়, বৈচিত্র্যময় নহে, ইহাতে স্তব্ধ করিয়া দেয়, উচ্ছ সিত করিয়া তুলে না। অতএব দেখা যাইতেছে বর্ষাকালে আমাদের "আমি" গাঢ়তর হয়, আর বসন্তকালে সে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাক, বসন্ত কালের বিরহ ও বর্ষাকালের বিরহে প্রভেদ কি। বসন্তকালে আমরা বহির্জগৎ উপভোগ করি; উপভোগের সমস্ত উপাদান আছে, কেবল একটি পাইতেছি না; উপভোগের একটা মহা অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি। সেই জন্যই আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এত দিন আমার সুখ ঘুমাইয়াছিল, আমার প্রিয়তম ছিল না; আমার আর কোন সুখের উপকরণও ছিল না। কিন্তু জ্যোৎস্না, বাতাস ও সুগন্ধে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া আমার সুখকে জাগাইয়া তুলিল; সে জাগিয়া দেখিল, তাহার দারুণ অভাব

বিদ্যমান। সে কাঁদিতে লাগিল। এই রোদনই বসন্তের বিরহ। দুর্ভিক্ষের সময় শিশু মরিয়া গেলেও মায়ের মন অনেকটা শান্তি পায়, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিয়া ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে থাকিলে তাঁহার কি কষ্ট!

বর্ষাকালে বিরহিণীর সমস্ত "আমি" একত্র হয়, সমস্ত "আমি" জাগিয়া উঠে, দেখে যে বিচ্ছিন্ন "আমি" একক "আমি" অসম্পূর্ণ। সে কাঁদিতে থাকে। সে তাহার নিজের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিবার জন্য কাহাকেও খুঁজিয়া পায় না। চারিদিকে বৃষ্টি পড়িতেছে, অন্ধকার করিয়াছে; কাহাকেও পাইবার নাই, কিছুই দেখিবার নাই; কেবল বসিয়া বসিয়া অন্তর্দেশের অন্ধকারবাসী একটি অসম্পূর্ণ, সঙ্গীহীন "আমি"-র পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহাই বর্ষাকালের বিরহ। বসন্তকালে বিরহিণীর জগৎ

অসম্পূর্ণ, বর্ষাকালে বিরহিনীর "স্বয়ং" অসম্পূর্ণ। বর্ষাকালে আমি আত্মা চাই, বসন্তকালে আমি সুখ চাই। সুতরাং বর্ষাকালের বিরহ গুরুতর। এ বিরহে যৌবন মদন প্রভৃতি কিছু নাই, ইহা বস্তুগত নহে। মদনের শর বসন্তের ফুল দিয়া গঠিত, বর্ষার বৃষ্টিধারা দিয়া নহে। বসন্তকালে আমরা নিজের উপর সমস্ত জগৎ স্থাপিত করিতে চাহি, বর্ষাকালে সমস্ত জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। ঋতুসংহারে কালিদাসের কাঁচা হাত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তিনি এই কাব্যে বর্ষা ও বসন্তের যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কালিদাস বলিয়া চিনা যায়। বসন্তের উপসংহারে তিনি বলেন,—

মলয়পবনবিদ্ধঃ কোকিলেনাভিরম্যো
সুরভিমধুনিষেকাল্লব্ধগন্ধপ্রবন্ধঃ।

বিবিধ মধুপযূথৈর্বেষ্ট্যমানঃ সমন্তাদ্
ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠ কালঃ সুখায়॥

কবি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, বাহ্য-সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট বসন্তকাল তোমাকে সুখ প্রদান করুক। বর্ষায় কবি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

"বহু গুণরমণীয়ো, যোষিতাং চিত্তহারী,
তরু বিটপলতানাং বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ,
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণ হেতুর্
দিশতু তব হিতানি প্রায়সো বাঞ্ছিতানি।"

বর্ষাকালে তোমাকে তোমার বাঞ্ছিত হিত অর্পণ করুক। বর্ষাকাল ত সুখের জন্য নহে, ইহা মঙ্গলের জন্য। বর্ষাকালে উপভোগের বাসনা হয় না, "স্বয়ং"-এর মধ্যে একটা অভাব অনুভব হয়, একটা অনির্দ্দেশ্য বাঞ্ছা জন্মে।

প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল।

উপরে বসন্ত ও বর্ষার যে প্রভেদ ব্যাখ্যা করিলাম, প্রভাত ও সন্ধ্যার সম্বন্ধেও তাহা অনেক পরিমাণে খাটে।

প্রভাতে আমি হারাইয়া যাই, সন্ধ্যাকালে আমি ব্যতীত বাকী আর সমস্তই হারাইয়া যায়। প্রভাতে আমি শত সহস্র মনুষ্যের মধ্যে এক-জন; তখন জগতের যন্ত্রের কাজ আমি সমস্তই দেখিতে পাই; বুঝিতে পারি আমিও সেই যন্ত্র-চালিত একটি জীব মাত্র; যে মহা নিয়মে সূর্য্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, জন-কোলাহল জাগিয়াছে আমিও সেই নিয়মে জাগিয়াছি, কার্য্য-ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতেছি; আমিও কোলাহল-সমুদ্রের একটি তরঙ্গ, চারিদিকে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ যে নিয়মে উঠিতেছে পড়িতেছে,

আমিও সেই নিয়মে উঠিতেছি পড়িতেছি। সন্ধ্যাকালে জগতের কল-কারখানা দেখিতে পাইনা, এই জন্য নিজেকে জগতের অধীন বলিয়া মনে হয় না; মনে হয় আমি স্বতন্ত্র, মনে হয় আমিই জগৎ।

প্রাতঃকালে জগতের আমি, সন্ধ্যাকালে আমার জগৎ। প্রাতঃকালে আমি সৃষ্ট, সন্ধ্যাকালে আমি স্রষ্টা। প্রাতঃকালে আমা হইতে গণনা আরম্ভ হইয়া জগতে গিয়া শেষ হয়, আর সন্ধ্যাকালে অতি দূর জগৎ হইতে গণনা আরম্ভ হইয়া আমাতে আসিয়া শেষ হয়। তখন আমিই জগতের পরিণাম, জগতের উপসংহার, জগতের পঞ্চমাঙ্ক। জগতের শোকান্ত বা মিলনান্ত নাটক আমাতে আসিয়াই তাহার সমস্ত উপাখ্যান কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। আমার পরেই যেন সে নাটকের যবনিকা-পতন। প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি

নাটকের সাধারণ পাত্রগণের মধ্যে একজন ছিল, সন্ধ্যাকালে সেই তাহার নায়ক হইয়া উঠে। প্রভাতে জগৎ অন্ধকারকে, স্তব্ধতাকে ও সেই সঙ্গে "আমি"-কে পরাজিত করিয়া তাহার নিজের রাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়া লয়। এই-রূপে প্রাতঃকালে আমি রাজা হই, সন্ধ্যা-কালে জগৎ রাজা হয়। প্রাতঃকালের আলোকে "আমি" মিশাইয়া যাই, ও সন্ধ্যাকালের অন্ধ-কারে জগৎ মিশাইয়া যায়। প্রাতঃকাল চারিদিক উদ্ঘাটন করিতে করিতে আমাদের নিকট হইতে অতি দূরে চলিয়া যায় ও সন্ধ্যাকাল চারিদিক রুদ্ধ করিতে করিতে আমাদের অতি কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। এক কথায়, প্রভাতে আমি জগৎ-রচনার কর্ম্মকারক ও সন্ধ্যাকালে আমি জগৎ রচনার কর্ত্তা কারক। প্রভাতে "আমি" নামক সর্ব্বনাম শব্দটি প্রথম পুরুষ, সন্ধ্যাবেলায় সে উত্তম পুরুষ।

আদর্শ প্রেম।

সংসারের কাজ-চালানে, মন্ত্রবদ্ধ, ঘর কন্নার ভালবাসা যেমনই হউক আমি প্রকৃত আদর্শ ভালবাসার কথা বলিতেছি। যে হউক এক জনের সহিত ঘেঁষাঘেষি করিয়া থাকা, এক ব্যক্তির অতিরিক্ত একটি অঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকা, তাহার পাঁচটা অঙ্গুলির মধ্যে ষষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় লগ্ন হইয়া থাকাকেই ভালবাসা বলে না। দুইটা আঠাবিশিষ্ট পদার্থকে একত্রে রাখিলে যে জুড়িয়া যায়, সেই জুড়িয়া যাওয়াকেই ভালবাসা বলে না। অনেক সময়ে আমরা নেশাকে ভালবাসা বলি। রাম ও শ্যাম উভয়ে উভয়ের কাছে হয় ত "মৌতাতের" স্বরূপ হইয়াছে, রাম ও শ্যাম উভয়কে উভয়ের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, রামকে নহিলে শ্যামের বা শ্যামকে নহিলে রামের

অভ্যাস ব্যাঘাতের দরুন কষ্ট বোধ হয়। ইহাকেও ভালবাসা বলে না। প্রণয়ের পাত্র নীচই হউক, নিষ্ঠুরই হউক্, আর কুচরিত্রই হউক্, তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকাকে অনেকে প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া থাকে। কিন্তু, ইহা বিবেচনা করা উচিত, নিতান্ত অপদার্থ দুর্ব্বল-হৃদয় নহিলে কেহ নীচের কাছে নীচ হইতে পারে না। এমন অনেক ক্রীতদাসের কথা শুনা গিয়াছে, যাহারা নিষ্ঠুর, নীচাশয় প্রভুর প্রতিও অন্ধভাবে আসক্ত, কুকুরেরাও সেইরূপ। এরূপ কুকুরের মত, ক্রীতদাসের মত ভালবাসাকে ভালবাসা বলিতে কোন মতেই মন উঠে না। প্রকৃত ভালবাসা দাস নহে, সে ভক্ত; সে ভিক্ষুক নহে সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্য্যকে ভালবাসেন, মহত্ত্বকে ভালবাসেন; তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শ ভাব জাগিতেছে, তাহারই প্রতিমাকে

ভালবাসেন। প্রণয়ের পাত্র যেমনই হউক, অন্ধ-ভাবে তাহার চরণ আশ্রয় করিয়া থাকা তাঁহার কর্ম্ম নহে। তাহাকে ত ভালবাসা বলে না, তাহাকে কর্দ্দম-বৃত্তি বলে। কর্দ্দম একবার পা জড়াইলে আর ছাড়িতে চায় না, তা' সে যাহারই পা হউক না কেন, দেবতারই হউক্ আর নরাধমেরই হউক্! প্রকৃত ভালবাসা যোগ্যপাত্র দেখিলেই আপনাকে তাহার চরণধূলি করিয়া ফেলে। এই নিমিত্ত ধূলিবৃত্তি করাকেই অনেকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করেন। তাঁহারা জানেন না যে, দাসের সহিত ভক্তের বাহ্য আচরণে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একটি প্রধান প্রভেদ আছে, ভক্তের দাসত্বে স্বাধীনতা আছে, ভক্তের স্বাধীন দাসত্ব। তেমনি প্রকৃত প্রণয় স্বাধীন প্রণয়। সে দাসত্ব করে কেননা দাসত্ব-বিশেষের মহত্ত্ব সে বুঝিয়াছে। যেখানে দাসত্ব

করিয়া গৌরব আছে, সেই খানেই সে দাস, যেখানে হীনতা স্বীকার করাই মর্য্যাদা, সেই খানেই সে হীন। ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা। তা' যদি না হয়, যদি ভালবাসা হীনের কাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্য্যের কাছে রুচিকে বদ্ধ করিয়া রাখে তবে ভালবাসা নিপাত যাক্।

বন্ধুত্ব ও ভালবাসা।

বন্ধুত্ব ও ভালবাসায় অনেক তফাৎ আছে, কিন্তু ঝট্ করিয়া সে তফাৎ ধরা যায় না।

বন্ধুত্ব আটপৌরে, ভালবাসা পোষাকী। বন্ধুত্বের আট-পৌরে কাপড়ে দুই এক জায়গায় ছেঁড়া থাকিলেও চলে, ঈষৎ ময়লা হইলেও

হানি নাই, হাঁটুর নীচে না পৌঁছিলেও পরিতে বারণ নাই। গায়ে দিয়া আরাম পাইলেই হইল। কিন্তু ভালবাসার পোষাক একটু ছেঁড়া থাকিবে না, ময়লা হইবে না, পরিপাটি হইবে। বন্ধুত্ব নাড়াচাড়া, টানাছেঁড়া, তোলাপাড়া সয়, কিন্তু ভালবাসা তাহা সয় না। আমাদের ভালবাসার পাত্র হীন প্রমোদে লিপ্ত হইলে আমাদের প্রাণে বাজে, কিন্তু বন্ধুর সম্বন্ধে তাহা খাটে না;—এমন কি, আমরা যখন বিলাস প্রমোদে মত্ত হইয়াছি, তখন আমরা চাই যে, আমাদের বন্ধুও তাহাতে যোগ দিক্। প্রেমের পাত্র আমাদের সৌন্দর্য্যের আদর্শ হইয়া থাক্ এই আমাদের ইচ্ছা—আর, বন্ধু আমাদেরই মত দোষে গুণে জড়িত মর্ত্ত্যের মানুষ হইয়া থাক্, এই আমাদের আবশ্যক। আমাদের ডান হাতে বাম হাতে বন্ধুত্ব। আমরা বন্ধুর নিকট হইতে মমতা চাই,

সমবেদনা চাই, সাহায্য চাই, ও সেই জন্যই বন্ধুকে চাই। কিন্তু ভালবাসার স্থলে আমরা সর্ব্ব প্রথমে ভালবাসার পাত্রকেই চাই, ও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পাইতে চাই বলিয়াই তাহার নিকট হইতে মমতা চাই, সমবেদনা চাই, সঙ্গ চাই। কিছুই না পাই যদি, তবুও তাহাকে ভাল বাসি। ভালবাসায় তাহাকেই আমি চাই, বন্ধুত্বে তাহার কিয়দংশ চাই। বন্ধুত্ব বলিতে তিনটি পদার্থ বুঝায়। দুই জন ব্যক্তি ও একটি জগৎ। অর্থাৎ দুই জনে সহযোগী হইয়া জগতের কাজ সম্পন্ন করা। আর প্রেম বলিলে দুই জন ব্যক্তি মাত্র বুঝায়, আর জগৎ নাই। দুই জনেই দুই জনের জগৎ। অতএব বন্ধুত্ব অর্থে দুই এবং তিন, প্রেম অর্থে এক এবং দুই।

অনেকে বলিয়া থাকেন বন্ধুত্ব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভালবাসায় উপনীত হইতে পারে,

কিন্তু ভালবাসা নামিয়া অবশেষে বন্ধুত্বে আসিয়া ঠেকিতে পারে না। একবার যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, হয় তাহাকে ভাল বাসিব, নয় ভাল বাসিব না, কিন্তু একবার যাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়াছে, ক্রমে তাহার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হইতে আটক নাই। অর্থাৎ বন্ধুত্বের উঠিবার নামিবার স্থান আছে, কারণ সে সমস্ত স্থান আটক করিয়া থাকে না। কিন্তু ভাল বাসার উন্নতি অবনতির স্থান নাই। যখন সে থাকে তখন সে সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকে, নয় সে থাকে না। যখন সে দেখে তাহার অধিকার হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তখন সে বন্ধুত্বের ক্ষুদ্র স্থানটুকু অধিকার করিয়া থাকিতে চায় না। যে রাজা ছিল, সে ফকির হইতে রাজি আছে, কিন্তু করদ জায়গীরদার হইয়া থাকিবে কিরূপে? হয় রাজত্ব, নয় ফকিরী, ইহার মধ্যে তাহার দাঁড়াইবার স্থান

নাই। ইহা ছাড়া আর একটা কথা আছে। প্রেম মন্দির ও বন্ধুত্ব বাসস্থান। মন্দির হইতে যখন দেবতা চলিয়া যায়, তখন সে আর বাস-স্থানের কাজে লাগিতে পারে না, কিন্তু বাসস্থানে দেবতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

আত্ম-সংসর্গ।

দুঃখের সুর একঘেয়ে কেন? বলা বাহুল্য, মন যেখানে বৈচিত্র্য দেখে না, সেখানে সে নিজের অন্তঃপুরের মধ্যে নিজে বসিয়া থাকে, কৌতূহল উদ্রেক না হইলে সে বাহির হইবার কোন আবশ্যক দেখে না। যাহা কিছু একঘেয়ে, তাহাই আমাদিগকে আমাদের নিজের কাছে প্রেরণ করে। এই জন্যই একঘেয়ে সুরের মধ্যে একটী করুণ ভাব আছে।

যখনি আমরা আমাদের নিজের কাছে থাকি, তখনি আমাদের দুঃখ। আমরা নিজের কাছ হইতে পলাইয়া থাকিতে পারিলেই সুখে থাকি। যখন বাহ্য জগত সুন্দর আকার ধারণ করে, তখন আমরা কেন সুখে থাকি? কারণ, তখন আমাদের মন তাহার নিজের হাত এড়াইয়া বাহিরে সঞ্চরণ করিতে পারে; আর যখন আমাদের চারিদিকে বাহ্য জগৎ কদর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন আমা-দের মনকে দায়ে পড়িয়া নিজের কাছেই ফিরিয়া আসিতে হয়, ও আমরা অসুখী হই। এই জন্যই, আমাদের অন্তর ও বাহির, আমাদের মন ও জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও জগতের উপর আমাদের মনের সুখ এতটা নির্ভর করে, যে, জগৎ বেঁকিয়া দাঁড়াইলেই আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে। সে নিজের কাছে কোন মতেই থাকিতে চায় না। সে একটী অভাব মাত্র।

সে এই বিশাল জগৎসংসারের মহা-ক্ষেত্রে প্রতি শব্দ, প্রতি দৃশ্য, প্রতি গন্ধ, প্রতি স্বাদকে শীকার করিয়া বেড়াইতেছে, যতক্ষণ শীকার করে ততক্ষণ থাকে ভাল, অবশেষে যখন রিক্তহস্তে শ্রান্ত দেহে গৃহে ফিরিয়া আসে তখনি তাহার দুঃখ। আমরা ভালবাসিতে চাই, কেননা আমরা আপনাকে চাই না, আর এক জনকে চাই; আমরা একটা কিছু কায করিতে চাই, কেননা আমরা নিজের কাছে থাকিতে চাই না; আমরা উপার্জ্জন করিতে চাই, কেননা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তিই অভাব। আমাদের মনের অর্থ— ভিক্ষার অঞ্জলি, জগতের অর্থ—ভিক্ষামুষ্টি। ভষ্ম-লোচনকে যেমন নিজের মুখ দেখাইয়া বধ করা হইয়াছিল, তেমনি সমস্ত জগৎ যদি একটী বিশাল দর্পণ হইত, চারিদিকে কেবল আমাদের নিজের মুখ দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমরা মরিয়া

যাইতাম। তাহা হইলে আমরা কি দেখিতাম? একটা ক্ষুধা, একটা দুর্ভিক্ষ, একটা প্রার্থনা, একটা রোদন। আমাদের মন গোটাকতক ক্ষুধার সমষ্টি মাত্র। জ্ঞানের ক্ষুধা, আসঙ্গের ক্ষুধা, সৌন্দর্য্যের ক্ষুধা। আমাদের দিকে অনন্ত জ্ঞানের পিপাসা, আর জগতের দিকে অনন্ত রহস্য। আমরা প্রাণের সহচর চাই, কিন্তু "লাখে না মিলল একে।" আমরা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চাই, অথচ সৌন্দর্য্যকে দুই হাতে স্পর্শ করিলেই সে মলিন হইয়া যায়। আমরা কৃষ্ণবর্ণ; সূর্য্য রশ্মির সমস্ত বর্ণধারা পান করিয়া থাকি তথাপি আমরা কালো। সূর্য্য রশ্মি পান করিবার আমাদের অনন্ত পিপাসা। এইরূপে অনন্ত জ্ঞানের ক্ষুধা লইয়া যে রহস্য দন্তস্ফুট করিতে পারিবনা তাহা-কেই অনবরত আক্রমন করা, অনন্ত আসঙ্গের ক্ষুধা লইয়া যে সহচর মিলিবে না তাহাকেই অবিরত

অন্বেষণ করা, অনন্ত সৌন্দর্য্যের ক্ষুধা লইয়া যে সৌন্দর্য্য ধরিয়া রাখিতে পারিব না তাহাকেই চির উপভোগ করিতে চেষ্টা করা, এক কথায়, অনন্ত মন অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ কতকগুলি অনন্ত ক্ষুধা লইয়া জগতের পশ্চাতে অনন্ত ধাবমান হওয়াই মনুষ্য জীবন। এই নিমিত্তই মন নিজের কাছে থাকিতে চায় না জগতের কাছে যাইতে চায়, ক্ষুধা নিজের কাছে থাকিতে চায় না, খাদ্যের কাছে থাকিতে চায়। আমরা মানুষরা কতকগুলা কালো কালো অসন্তোষের বিন্দু, ক্ষুধার্ত্ত পিপীলিকার মত জগৎকে চারিদিক হইতে ছাঁকিয়া ধরিয়াছি; উষাকে, জ্যোৎস্নাকে, গানের শব্দকে দংশন করিতেছি, একটুখানি খাদ্য পাইবার জন্য। হায় রে, খাদ্য কোথায়! হে সূর্য্য, উদয় হও! চন্দ্র হাস! ফুল, ফুটিয়া ওঠ! আমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা কর; আমাকে যেন

আমার পাশে বসিয়া না থাকিতে হয় ; অনিচ্ছা-রচিত বাসর শয্যায় শুইয়া আমাকে যেন আমার আলিঙ্গনে পড়িয়া কাঁদিতে না হয়।

বধিরতার সুখ।

অদ্বিতীয় রমণী ও অসাধারণ পুরুষ জর্জ্ এলিয়ট্ তাঁহার একটি উপন্যাসে লিখিয়াছেন যে, আমরা জীবনে অনেক ছোট ছোট দুঃখ ঘটনা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা এত সাধারণ ও সামান্য-কারণজাত যে, তাহাতে আর আমাদের করুণা উদ্রেক করিতে পারে না, তাহা যদি পারিত, তবে জীবন কি কষ্টেরই হইত! যদি আমরা কাঠ-বিড়ালীর হৃদয়-স্পন্দন শুনিতে পাইতাম, যখন একটি ঘাস মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গজাই-তেছে, তখন তাহার শব্দ টুকুও শুনিতে পাই-

তাম, তবে আমাদের কানের পক্ষে কি দুর্দ্দশাই হইত! আমরা যেমন দিগন্ত পর্য্যন্ত সমুদ্র প্রসারিত দেখিতে পাই, কিন্তু সমুদ্রের সীমা সেই খানেই নয়, তাহা অতিক্রম করিয়াও সমুদ্র আছে; তেমনি আমরা যাহাকে স্তব্ধতার দিগন্ত বলি, তাহার পরপারেও শব্দের সমুদ্র আছে, তাহা আমাদের শ্রবণের অতীত। পিপীলিকা যখন চলে, তখন তাহারো পদশব্দ হয়, ফুল হইতে শিশির যখন পড়ে, তখন সেও নীরব অশ্রুজল নহে, সেও বিলাপ করিয়া ঝরিয়া পড়ে।

জর্জ্ এলিয়ট অন্যের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিজের সম্বন্ধেও তাহাই প্রয়োগ করিয়া দেখিব। মনে কর, আমাদের নিজের হৃদয়ের মধ্যে যাহা চলে তাহা সমস্তই আমরা যদি দেখিতে পাইতাম, শুনিতে পাইতাম তাহা হইলে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইত! জর্জ্

এলিয়ট্ দৃষ্টান্ত স্বরূপে কাঠবিড়ালীর হৃদয় স্পন্দন ও তৃণ-উদ্ভেদের শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা যদি নিজের দেহের ক্ষীণতম হৃদয়-স্পন্দন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পতন, রক্ত চলাচলের শব্দ, নখ ও কেশ বৃদ্ধি, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে দেহায়তন বৃদ্ধির শব্দটুকুও অনবরত শুনিতে পাইতাম, তবে আমাদের কি দশাই হইত। যখন আমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছি, তখনো আমাদের হৃদয়ের মর্ম্ম স্থলে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে বসিয়া যে একটি বিষাদ, একটি অভাব নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা যদি শুনিতে পাইতাম, তবে কি আর হাসি বাহির হইত? যখন আমরা দান করিতেছি, ও সেই সঙ্গে "নিস্বার্থ পরোপকার করিতেছি" মনে করিয়া মনে মনে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তখন যদি আমরা আমাদের সেই পরোপচিকীর্ষার অতি প্রচ্ছন্ন অন্ত-

দেশে যশোলিপ্সা বা আর একটা কোন ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার বক্রমূর্ত্তি দেখিতে পাই, তবে কি আর আমরা সেরূপ বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারি? আবার আর এক দিকে দেখ। যেমন, এমন শব্দ আছে, যাহা আমাদের কাছে নিস্তব্ধতা, তেমনি এমন স্মৃতি আছে, যাহা আমাদের কাছে বিস্মৃতি। আমরা যাহা একবার দেখিয়াছি, যাহা একবার শুনিয়াছি, তাহা আমাদের হৃদয়ে চিরকালের মত চিহ্ন দিয়া গিয়াছে। কোনটা বা স্পষ্ট, কোনটা বা অস্পষ্ট, কোনটা বা এত অস্পষ্ট যে, আমাদের দর্শন শ্রবনের অতীত। কিন্তু আছে। আমাদের স্মৃতিতে যত জিনিষ আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। আমরা রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া যে শত সহস্র অচেনা লোককে চলিয়া যাইতে দেখিলাম, তাহারা প্রত্যেকেই আমাদের মনের মধ্যে

রহিয়া গেল। উপরি উপরি যদি অনেক বার তাহাদের দেখিতাম, তবে তাহারা আমাদের স্মৃতিতে স্পষ্টতর ছাপ দিতে পারিত এই মাত্র। এই রূপে বাল্যকাল হইতে যাহা কিছু দেখিয়াছি, যাহা কিছু শুনিয়াছি, যাহা কিছু পড়িয়াছি, সমস্তই আমার হৃদয়ে আছে, তিলার্দ্ধও এড়াইতে পারে নাই। ছেলে বেলা হইতে কত গ্রন্থের কত হাজার হাজার পাত পড়িয়াছি, যদিও তাহা আওড়াইতে পারি না, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মুদ্রাকর তাহার প্রত্যেক অক্ষর আমাদের স্মৃতির পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা মনে করিলে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িতে হয়। যদি আমরা আমাদের এই অতি বিশাল স্মৃতির স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সমস্ত কণ্ঠস্বর একেবারেই শুনিতে পাইতাম, কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতাম না, তাহা হইলে আমরা কি একেবারে পাগল

হইয়া যাইতাম না? ভাগ্যে আমাদের স্মৃতি তাহার সহস্র মুখে একেবারে কথা কহিতে আরম্ভ করে না, তাহার সহস্র চিত্র একেবারে উদ্ঘাটন করিয়া দেয় না, তাই আমরা বাঁচিয়া আছি। আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কার্য্য দেখিতে পাই না বলিয়াই রক্ষা। আমাদের হৃদয়-রাজ্যের অনেক বিস্তৃত প্রদেশ আমাদের নিজের কাছেই যদি অনাবিষ্কৃত না থাকিত; কখন্ আমাদের অনুরাগের প্রথম সূত্রপাত হইল, কখন্ আমাদের অনুরাগের প্রথম অবসানের দিকে গতি হইল, কখন্ আমাদের বিরাগের প্রথম আরম্ভ হইল, কখন্ আমাদের বিষাদের প্রথম অঙ্কুর উঠিল, তাহা সমস্ত যদি আমরা স্পষ্ট দেখিতাম তাহা হইলে আমাদের মায়া মোহ অনেকটা ছুটিয়া যাইত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখ শান্তিও অবসান হইত।

শূন্য।

এক এক জন লোক আছে, তাহারা যতক্ষণ একলা থাকে ততক্ষণ কিছুই নহে; একটা শূন্য (০) মাত্র, কিন্তু একের সহিত যখনি যুক্ত হয়, তখনি দশ (১০) হইয়া পড়ে। একটা আশ্রয় পাইলে তাহারা কি না করিতে পারে! সংসারে শত সহস্র 'শূন্য' আছে, বেচারীদের সকলেই উপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার একমাত্র কারণ, সংসারে আসিয়া তাহারা উপযুক্ত 'এক' পাইল না, কাজেই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার মধ্যেই হইল। এই সকল শূন্যদের এক মহা দোষ এই যে, পরে বসিলে ইহার ১কে ১০ করে বটে, কিন্তু আগে বসিলে দশমিকের নিয়মানুসারে ১কে তাহার শতাংশে পরিণত করে (০১) অর্থাৎ ইহারা অন্যের দ্বারায় চালিত হইলেই চমৎকার কাজ

করে বটে, কিন্তু অন্যকে চালনা করিলে সমস্ত মাটি করে। ইহারা এমন চমৎকার সৈন্য যে মন্দ সেনাপতিকেও জিতাইয়া দেয়, কিন্তু এমন খারাপ সেনাপতি যে, ভাল সৈন্যদেরও হারাইয়া দেয়। স্ত্রী-মর্য্যাদা-অনভিজ্ঞ গোঁয়ারগণ বলেন যে, স্ত্রীলোকেরা এই শূন্য। ১এর সহিত যত-ক্ষণ তাহারা যুক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহারা শূন্য। কিন্তু ১এর সহিত বিধিমতে যুক্ত হইলে সে ১কে এমন বলীয়ান করিয়া তুলে যে সে দশের কাজ করিতে পারে। কিন্তু এই শূন্যগণ যদি ১এর পূর্ব্বে চড়িয়া বসেন তবে এই ১ বেচারীকে তাহার শতাংশে পরিণত করেন। স্ত্রৈণ পুরুষের আর এক নাম ০১। কিন্তু এই অযৌক্তিক লোকদের সঙ্গে আমি মিলি না।

স্ত্রৈণ।

আমি দেখিতেছি, মহিলারা রাগ করিতেছেন, অতএব স্ত্রৈণ কাহাকে বলে তাহার একটা মীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। এই কথাটা সকলেই ব্যবহার করেন কিন্তু ইহার অর্থ অতি অল্প লোকেই সর্ব্বতোভাবে বুঝেন। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে কিছু বিশেষরূপ ভালবাসে সাধারণতঃ লোকে তাহাকেই স্ত্রৈণ বলে। কিন্তু বাস্তবিক স্ত্রৈণ কে? না, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে আশ্রয় দিতে পারে না, স্ত্রীর উপর নির্ভর করে। বলিষ্ঠ পুরুষ হইয়াও অবলা নারীকে ঠেসান দিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পড়িয়া গেলে স্ত্রীকে ধরিয়া উঠে, মরিয়াগেলে স্ত্রীকে লইয়া মরে; যে ব্যক্তি সম্পদের সময় স্ত্রীকে পশ্চাতে রাখে, ও বিপদের সময় স্ত্রীকে সম্মুখে ধরে, এক

কথায় যে ব্যক্তি "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" ইহাই সার বুঝিয়াছে সেই স্ত্রৈণ। অর্থাৎ ইহারা সমস্তই উল্টাপাল্টা করে। ইংরাজ জাতিরা স্ত্রৈণের ঠিক বিপরীত। কারণ তাহারা স্ত্রীকে হাত ধরিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দেয়, স্ত্রীর মুখে আহার তুলিয়া দেয়, স্ত্রীকে ছাতা ধরে, ইত্যাদি। তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে এতই দুর্ব্বল মনে করে যে, সকল বিষয়েই তাহাদিগকে সাহায্য করে। ইহাদিগকে দেখিয়া স্ত্রৈণ জাতি মুখে কাপড় দিয়া হাসে ও বলে "ইংরাজেরা কি স্ত্রৈণ! কোথায় গর্ম্মি হইলে স্ত্রী সমস্ত রাত জাগিয়া তাহাকে বাতাস দিবে,না সে স্ত্রীকে বাতাস দেয়! কোথায় যতক্ষণ না বলিষ্ঠ পুরুষদের তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার নিঃশেষ হয় ততক্ষণ অবলা জাতিরা উপ-বাস করিয়া থাকিবে, না বলীয়ান পুরুষ হইয়া অবলার মুখে আহার তুলিয়া দেয়! ছি ছি কি

লজ্জা! এমন যদি হইল তবে আর বল কিসের জন্য!"

জমা খরচ।

এক গণিত লইয়া এত কথা যদি হইল তবে আরো একটা বলি; পাঠকেরা ধৈর্য্য সংগ্রহ করুন। পাটীগণিতের যোগ এবং গুণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে। সংসারের খাতায় আমরা এক একটা সংখ্যা, আমাদের লইয়া অদৃষ্ট অঙ্ক কসিতেছে। কখন বা শ্রীযুক্ত বাবু ৬-য়ের সহিত শ্রীমতী ৩-এর যোগ হইতেছে, কখনো বা শ্রীযুক্ত ১-এর সহিত শ্রীমান ৠ-এর বিয়োগ হইতেছে ইত্যাদি। দেখা যায়, এ সংসারে যোগ সর্ব্বদাই হয়, কিন্তু গুণ প্রায় হয় না। গুণ কাহাকে কলে? না, যোগের অপেক্ষা যাহাতে

অধিক যোগ হয়। ৩-এ ৩ যোগ করিলে ৬ হয়, ৩-এ ৩ গুণ করিলে ৯ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, গুণ করিলে যতটা যোগ করা হয়, এমন যোগ করিলে হয় না। মনোগণিত শাস্ত্রে প্রাণে প্রাণে গুণে গুণে মিলকে গুণ বলে ও সামান্যতঃ মিলন হইলে যোগ বলে। সামান্যতঃ বিচ্ছেদ হইলে বিয়োগ বলে ও প্রাণে প্রাণে বিচ্ছেদ হইলে ভাগ বলে। বলা বাহুল্য গুণে যেমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ হয়, ভাগে তেমনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিয়োগ হয়। এমন কি আমার বিশ্বাস এই যে, অদৃষ্ট পাটীগণিতের যোগ বিয়োগ ও গুণ পর্য্যন্ত শিখিয়াছে, কিন্তু ভাগটা এখনো শিখে নাই, সেইটে কষিতে অত্যন্ত ভুল করে। মনে কর, ৩-কে ২ দিয়া গুণ করিয়া ৬ হইল, সেই ৬ কে পুনর্ব্বার ২ দিয়া ভাগ কর, ৩ অবশিষ্ট থাকিবে। তেমনি রাধাকে শ্যাম দিয়া গুণ কর

রাধাশ্যাম হইল, আবার রাধাশ্যামকে শ্যাম দিয়া ভাগ কর, রাধা অবশিষ্ট থাকা উচিত কিন্তু তাহা থাকে না কেন? রাধারও অনেকটা চলিয়া যায় কেন? শ্যামের সহিত গুণ হইবার পূর্ব্বে রাধা যাহা ছিল, শ্যামের সহিত ভাগ হইবার পরেও রাধা কেন পুনশ্চ তাহাই হয় না? অদৃষ্টের এ কেমনতর অঙ্ক কষা! হিসাবের খাতায় এই দারুণ ভুলের দরুণ ত কম লোকসান হয় না! প্রস্তাব-লেখক এই খানে একটি বিজ্ঞাপন দিতেছেন। একটি অত্যন্ত দুরূহ অঙ্ক কষিবার আছে, এ পর্য্যন্ত কেহ কষিতে পারে নাই। যে পাঠক কষিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে পুরস্কার দিব। আমার এই হৃদয়টি একটি ভগ্নাংশ; আর একটি সংখ্যার সহিত গুণ করিয়া ইহা যিনি পূরণ করিয়া দিবেন তাঁহাকে আমার সর্ব্বস্ব পারিতোষিক দিব।

মনোগণিত।

পাটীগণিত, রেখাগণিত, ও বীজগণিতের নিয়ম সকল পণ্ডিতগণ বাহির করিলেন, কিন্তু এখনো মনোগণিতে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রতিভা-সম্পন্ন পাঠকদিগকে বলিয়া রাখিতেছি, একটা আবিষ্কারের পথ এই "উনবিংশ শতাব্দীতেও" গুপ্ত রহিয়াছে। অনেক অশিক্ষিত লোকে যেমন বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী ও নিয়ম না জানিয়াও কেবল বুদ্ধি, অভ্যাস ও শুভঙ্করের নিয়মে অঙ্ক কষিতে পারে, তেমনি কবিগণ এতকাল ধরিয়া মনোগণিতের অঙ্ক কষিয়া আসিতেছেন। শকুন্তলা কষিতেছেন, হ্যামলেট কষিতেছেন এবং মহাভারত রামায়ণে অঙ্কের স্তূপ কষিতেছেন। এইরূপ করিয়াই, বোধ করি, ক্রমে মনোগণিতের নিয়ম সকল বাহির হইবে। ইহা যে নিতান্ত দুরূহ তাহা বলা বাহুল্য; ফরাসী

জাতি, ইংরাজ জাতি, জর্ম্মাণ জাতি এই মনো-গণিতের এক একটা অঙ্ক-ফল। ঐতিহাসিকগণ, কি কি অঙ্কের যোগে বিয়োগে এই সকল অঙ্ক-ফল হইয়াছে, তাহাই কষিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন। কাহারো ভুল হয়, কাহারো ঠিক হয়, কিন্তু এত বড় অঙ্কবিৎ কেহ নাই যে, ঠিক মীমাংসা করিয়া দিতে পারে। আমাদের মধ্যে অদৃশ্য অলক্ষিত ভাবে ভিতরে ভিতরে কি কম অঙ্ক কষাকষি চলিতেছে! তোমাতে আমাতে মিলন হইল। তোমার খানিকটা আমাতে আসিল, আমার খানিকটা তোমাতে গেল, আমার একটা গুণ হয়ত হারাইলাম, তোমার একটা গুণ হয়ত পাইলাম, ও তাহা আমার আর একটা গুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিল। এইরূপে মানুষে মানুষে ও তাহাই শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া সমস্ত জাতিতে, ও অবশেষে

জাতিতে জাতিতে যোগ গুণ ভাগ বিয়োগ হইয়া মনুষ্য জাতি নামক একটা অতি প্রকাণ্ড অঙ্ক কষা হইতেছে। বিপ্লব (Revolution) নাম কবিতায় Matthew Arnold বলেন যে "মানুষ যখন মর্ত্ত্য-লোকে আসিবার উদ্যোগ করিল তখন ঈশ্বর তাহাদের হাতে রাশীকৃত অক্ষর দিলেন ও কহি-লেন, এই অক্ষর গুলি যথারীতি সাজাইয়া এক একটা কথা বাহির কর। মানুষেরা অক্ষর উণ্টা-ইয়া পাণ্টাইয়া সাজাইতে আরম্ভ করিল; "গ্রীস্" লিখিল, "রোম" লিখিল, "ফ্রান্স" লিখিল, "ইং-লণ্ড" লিখিল। কিন্তু কে ভিতরে ভিতরে বলি-তেছে যে, ঈশ্বর যে কথাটি লিখাইতে চান্ সেটি এখনো বাহির হইল না। এই নিমিত্ত মানুষেরা অসন্তুষ্ট হইয়া এক একবার অক্ষর ভাঙ্গিয়া ফেলে; ইহাকেই বলে বিপ্লব।" কবি যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিতে চাহি।

আমি বলি কি, ঈশ্বর মর্ত্ত্যভূমির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে মনুষ্য নামক কতকগুলি সংখ্যা দিয়াছেন ও পূর্ণ সুখ (যাহার আর এক নাম মঙ্গল) নামক অঙ্ক ফল দিয়াছেন। এবং পৃথিবীর পত্রে এই অঙ্ক ফলটি কষিবার আদেশ দিয়াছেন। সে যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই নিতান্ত দুরূহ অঙ্কটি কষিয়া আসিতেছে, এখনো কষা ফুরায় নি, কবে ফুরাইবে, কে জানে! তাহার এক একবার যখনি মনে হয় অঙ্কে ভুল হইল, তৎক্ষণাৎ সে সমস্তটা রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলে। ইহাকেই বলে বিপ্লব।

নৌকা।

মানুষের মধ্যে এক একটা মাঝি আছে, তাহাদের না আছে দাঁড়, না আছে পাল, না আছে গুণ, তাহাদের না আছে বুদ্ধি, না আছে প্রবৃত্তি,

না আছে অধ্যবসায়। তাহারা ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া স্রোতের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। মাঝীকে জিজ্ঞাসা কর "বাপু, বসিয়া আছ কেন?" সে উত্তর দেয় "আজ্ঞা, এখনো জোয়ার আসে নাই!" "গুণ টানিয়া চল না কেন?" "আজ্ঞা সে গুণটি নাই!" "জোয়ার আসিতে আসিতে তোমার কাজ যদি ফুরাইয়া যায়?" "পাল-তুলা, দাঁড়-টানা অনেক নৌকা যাইতেছে, তাহাদের বরাৎ দিব।" অন্যান্য চলতি নৌকা সকল অনুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে কাছি দিয়া পশ্চাতে বাঁধিয়া লয়, এইরূপে এমন শত শত নৌকা পার পায়। সমাজের স্রোত না কি প্রায় একটানা, বিনাশের সমুদ্রমুখেই তাহার স্বাভাবিক গতি। উন্নতির পথে, অমরতার পথে যাহাকে যাইতে হয় তাহাকে উজান বাহিয়া যাইতে হয়। যে সকল দাঁড় ও পাল-বিহীন নৌকা স্রোতে গা-

ভাসান্ দেয়, প্রায় তাহারা বিনাশ-সমুদ্রে গিয়া পড়ে। সমাজের অধিকাংশ নৌকাই এইরূপ, প্রত্যহ রাম শ্যাম প্রভৃতি মাঝীগণ আনন্দে ভাবিতেছে "যেরূপ বেগে ছুটিয়াছি, না জানি কোথায় গিয়া পৌঁছাইব।" একটি একটি করিয়া বিস্মৃতির সাগরে গিয়া পড়ে ও চোখের আড়াল হইয়া যায়। সমুদ্রের গর্ভে ইহাদের সমাধি, স্মরণ-স্তম্ভে ইহাদের নাম লিখা থাকে না।

বুদ্ধি খাটাইয়া যাহাদের অগ্রসর হইতে হয়, তাহাদের বলে—দাঁড়টানা নৌকা। অত্যন্ত মেহন্নত করিতে হয়, উঠিয়া পড়িয়া দাঁড় না টানিলে চলে না। কিন্তু তবুও অনেক সময়ে স্রোত সামলাইতে পারে না। অসংখ্য দাঁড়ের নৌকা প্রাণপণে দাঁড় টানিয়াও হটিতে থাকে, অবশেষে টানাটানি করিতে কাহারো বা দাঁড় হাল ভাঙ্গিয়া যায়। সকলের অপেক্ষা ভাল

চলে পালের নৌকা। ইহাদের বলে—প্রতিভার নৌকা। ইহারা হঠাৎ আকাশের দিক হইতে বাতাস পায় ও তীরের মত ছুটিয়া চলে। স্রোতের বিরুদ্ধে ইহারাই জয়ী হয়। দোষের মধ্যে, যখন বাতাস বন্ধ হয়, তখন ইহাদিগকে নোঙর করিয়া থাকিতে হয়, আবার যখনি বাতাস আসে তখনি যাত্রা আরম্ভ করে। আর একটা দোষ আছে, পালের নৌকা হঠাৎ কাৎ হইয়া পড়ে। পার্থিব নৌকা হাল্কা, অথচ পালে স্বর্গীয় বাতাস খুব লাগিয়াছে, ঝট করিয়া উল্টাইয়া পড়ে। কেহ কেহ এমন কথা বলেন যে, সকলেরই কল বাহির হইতেছে, বুদ্ধিরও কল বাহির হইবে; তখন আর প্রতিভার পালের আবশ্যক করিবে না, মনুষ্য-সমাজে ষ্টীমার চলিবে। মানুষ যতদিন অসম্পূর্ণ মানুষ থাকিবে, ততদিন প্রতিভার আবশ্যক। যদি কখনো সম্পূর্ণ

দেবতা হইতে পারে তখন কি নিয়মে চলিবে, ঠিক বলিতে পারিতেছি না। প্রতিভার কল বাহির করিতে পারে, এত বড় প্রতিভা কোথায়?

ফল ফুল।

পাঠক খরিদ্দার লেখক ব্যাপারির প্রতি। "কেন হে, আজকাল তোমার এখানে তেমন ভাল ভাব পাওয়া যায় না কেন?

লেখক। "মহাশয়, আমার এ ফল ফুলের দোকান। মিঠাই মণ্ডার নহে, যে, নিজের হাতে গড়িয়া দিব। আমার মাথার জমীতে কতকগুলা গাছ আছে। আপনি আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আপনাকে নিয়মিত ফল ফুল যোগাইতে হইবে। কিন্তু ঠিক্ নিয়ম অনুসারে ফল ফুল ফলেও না, ফুটেও না; কখন্ ফলে, কখন্ ফুটে

বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু তাহা করিলে চলে না, আপনি প্রত্যহ তাগাদা করিতে থাকেন, কৈ হে, ফুল কই, ফল কই? ফল ধোঁয়া দিয়া বল পূর্ব্বক পাকাইতে হয়, কাজেই আপনারা গাছপাকা ভাবটি পান না। এমন একটা প্রবন্ধ তৈরি হয়, তাহার আঁঠির কাছটা হয়ত টক, খোসার কাছে হয় ত ঈষৎ মিষ্ট; তাহার এক জায়গায় হয়ত থলথোলে, আর এক জায়গায় হয়ত কাঁচা শক্ত। ফুল ছিঁড়িয়া ফোটা-ইতে হয়; এমন একটা কবিতা তৈরি হয়, যাহার ভালরূপ রঙ্ ধরে নাই, গন্ধ জন্মে নাই, পাপ্‌ড়ি-গুলি কোঁক্‌ড়ানো। রহিয়া বসিয়া কিছু করিতে পারি না সমস্তই তাড়াতাড়ি করিতে হয়। দেখুন্ দেখি গাছে কত কুঁড়ি ধরিয়াছে! কি দুঃখ যে, গাছে রাখিয়া ফুটাইতে পারি না। আমাদের দেশীয় কন্যার পিতারা যেমন মেয়েকুঁড়ি গাছে

রাখিতে পারেন না, ৮ বৎসরের কুঁড়িটিকে ছিঁড়িয়া বিবাহ দিয়া বল পূর্ব্বক ফুটাইয়া তুলেন, ও বেচারীদের বিশ বৎসরের মধ্যে ঝরিয়া পড়িবার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আমার বলপূর্ব্বক-ফোটান, কবিতার কুঁড়ি গুলিও দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আমার আর একটা আপ্‌শোষ আছে ; আমার যে কুঁড়ি-গুলি ফুটিল না, সে গুলি যদি ফুটিত, যে মুকুল-গুলি ঝরিয়া গেল, তাহাতে যদি ফল ধরিত, তবে কি কীর্ত্তিই লাভ করিতাম।"

মাছ ধরা।

উপরের কথা হইতে একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে : ভাবের সরোবরে আমরা জাল

ফেলিয়া মাছ ধরিতে পারি না; ছিপ ফেলিয়া ধরিতে হয়। মাছ ধরিবার জাল আবিষ্কার হয় নাই, জানি না, কোন কালে হইবে কি না। ছিপ্ ফেলিয়া বসিয়া আছি, কখন্ মাছ আসিয়া ঠোক্-রায়। কিন্তু ঠোক্রাইলেই হইল না, মাছকে ডাঙ্গায় তোলাই আসল কাজ। জলের মধ্যে অনেক ভাব কিল্‌বিল্ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা-দের ডাঙ্গায় উঠাইয়া তোলা সাধারণ ব্যাপার নহে। ঠোক্রাইল, বঁড়শি লাগিল না; বঁড়শি লাগিল, ছিঁড়িয়া পলাইল। অনেক মাছ যতক্ষণ জলে আছে, যতক্ষণ খেলাইতেছি, ততক্ষণ মনে হইতেছে প্রকাণ্ড, তুলিয়া দেখি, যত বড় মনে হইয়াছিল, তত বড়টা নয়। ভাব আকর্ষণ করিবার জন্য কত প্রকার চার ফেলিতে হয়, কত কৌশল করিতে হয়, তাহা ভাব-ব্যবসায়ীরা জানেন। জল নাড়া না পায়, খুব স্থির থাকে;

তাব যখন বঁড়শি-বিদ্ধ হইল, তবুও জোর করিতেছে, উঠিতেছে না, তখন যেন অধীর হইয়া, টানাহেঁচড়া করিয়া উঠাইবার চেষ্টা না করা হয়, তাহা হইলে সূতা ছিঁড়িয়া যায়, যথেষ্ট খেলাইয়া আয়ত্ত করিয়া তুলিবে। আমরা পরের মনঃসরোবর হইতেও মাছ তুলিয়া থাকি। আমার এক সহচর আছেন, তাঁহার পুষ্করিণী আছে, কিন্তু ছিপ নাই। অবসরমত আমি তাঁহার মন হইতে মাছ ধরিয়া থাকি, খ্যাতিটা আমার। নানা প্রকার কথোপকথনের চার ফেলিয়া তাঁহার মাছ গুলাকে আকর্ষণ করিয়া আনি, ও খেলাইয়া খেলাইয়া জমীতে তুলি।

ইচ্ছার দাম্ভিকতা।

এক জন কবি স্মৃতি সম্বন্ধে বলিতেছেন, যে, জীবনের প্রতি বিধাতার এ কি অভিশাপ যে, কাহারো প্রতি অনুরাগ, বা কোন একটা প্রবৃত্তি, ভুলিয়া যাওয়া যখন আমাদের আবশ্যক হয়,—মহত্তর, উন্নততর, প্রশান্ততর কর্ত্তব্য আসিয়া যখন আদেশ করে ভুলিয়া যাও, তখন আমরা ভুলি না ; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতিদিন, সামান্য ঘটনার তুচ্ছ ধূলিকণা সমূহ আনিয়া আমাদের স্মৃতি ঢাকিয়া দেয় ও অবশেষে আমরা ভুলি ; ভুলিতেই হইবে বলিয়া ভুলি, ভুলিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া ভুলি না।—বাস্তবিক, এ কি দুঃখ! আমরা নিজের মনের উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করিলাম, সে কোন কাজে লাগিল না, আর আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বহিস্থিত

সামান্য কতকগুলা জড় ঘটনা সেই কাজ সিদ্ধ করিল! একটা কেন, এমন সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একজন সর্ব্বতোভাবে ভাল বাসিবার যোগ্যপাত্র; জানি, তাহাকে ভাল বাসিলে সুখী হইব ও আমার সকল বিষয়ে মঙ্গল হইবে, প্রতিনিয়ত ইচ্ছা করিয়াও তাহাকে ভাল বাসিতে পারিলাম না। আর এক জনকে ভাল বাসিলুম কেন? না, তাহার সঙ্গে কি লগ্নে, কি মাহেন্দ্র ক্ষণে দেখা হইয়াছিল, তাহার কি একটি সামান্য কথার ভাব, কি একটি তুচ্ছ ভাবের আধখানা মাত্র দেখিয়াছিলাম, বলা নাই, কহা নাই, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একেবারে সমস্ত হৃদয়টা তাহার পায়ের তলায় ফেলিয়া দিলাম। কোন লেখক যখন কেবল মাত্র ইচ্ছাকে ভাব শিকার করিতে পাঠান, তখন ইচ্ছার পায়ের শব্দ পাইলেই ভাবেরা কে কোথায় পালাইয়া যায় তাহার ঠিকানা পা-

ওয়া যায় না, ও সমস্ত দিনের পর শ্রান্ত ইচ্ছা তাহার বড় বড় কামান বন্দুক ফেলিয়া কপালের ঘর্ম্মজল মুছিতে থাকে, অথচ কোথা-হইতে-কি-একটা সামান্য বিষয় সহসা আসিয়া বিনা আয়াসে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শত সহস্র জীবন্ত ভাব আনিয়া উপস্থিত করে ও ইচ্ছার পশ্চাতে করতালি দিতে থাকে। কবিদের জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের কত বড় বড় ভাব দৈবাৎ কথার মিল করিতে গিয়া মনে পড়িয়াছে, ইচ্ছা করিলে মনে পড়িত না। মানুষের অনেক বড় বড় আবিষ্ক্রিয়ার মূল অনুসন্ধান করিতে যাও দেখিবে,—একটা সামান্য একরত্তি ব্যাপার।

দেখা যাইতেছে, আমাদের ইচ্ছা বলিয়া একটা বিষম দাম্ভিক ব্যক্তিকে আমাদের মন গাঁয়ে অতি অল্প লোকেই মানিয়া থাকে, অথচ সে একজন আপনি-মোড়ল। ছোট ছোট কতকগুলি সামান্য

বিষয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য, অথচ সকলকেই তিনি আদেশ করিয়া বেড়ান। একটা কাজ সমাধা হইলে তিনি জাঁক করিয়া বেড়ান এ কাজের কল আমি টিপিয়া দিয়াছিলাম। অথচ কত ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম বিষয় তাঁহার নিজের কল টিপিয়া দিয়াছে তাহার খবর রাখেন না। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে, তিনি দেখিতেছেন, দুশ্ছেদ্য লৌহের লাগাম দিয়া সমস্ত কাজকে তিনি চালাইয়া বেড়াইতেছেন, পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন না, তাঁহাকে কে মাকড়্সার জালের চেয়ে সূক্ষ্মতর তুচ্ছতর সহস্র সূত্রে বাঁধিয়া নিয়মিত করিতেছে! মনে করিতে কষ্ট হয় কত অল্প বিষয়ই আমাদের ইচ্ছার অধীন ও কত সহস্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অধীন আমাদের ইচ্ছা!

অভিনয়।

এই জন্যই বহুকাল হইতে লোকে বলিয়া আসিতেছে, আমরা অদৃষ্টের খেলেনা। আমাদের লইয়া সে খেলা করিতেছে। সুখের বিষয় এই যে, নিতান্ত ছেলেখেলা নয়। একটা নিয়ম আছে, একটা ফল আছে। অভিনয়ের সঙ্গে মনুষ্য জীবনের তুলনা পুরাণো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কেবল মাত্র সেই অপরাধে সে তুলনাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত করা যায় না। অভিনয়ের সঙ্গে মনুষ্য-জীবনের অনেক মিল পাওয়া যায়। প্রত্যেক অভিনেতার অভিনয় আলাদা আলাদা করিয়া দেখিলে সকলি ছাড়া ছাড়া বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে হয়, একটা অর্থ পাওয়া যায় না। তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনলীলা সাধারণ মনুষ্য-জীবন হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে নিতান্ত

অর্থ-শূন্য বলিয়া বোধ হয়, অদৃষ্টের ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা নহে; আমরা একটা মহা-নাটক অভিনয় করিতেছি; প্রত্যে-কের অভিনয়ে তাহার উপাখ্যান ভাগ পরিপুষ্ট হইতেছে। এক এক জন অভিনেতা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতেছে, নিজের নিজের পালা অভিনয় করিতেছে ও নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, সে জানে না, তাহার ঐ জীবনাংশের অভিনয়ে সমস্ত নাট-কের উপাখ্যানভাগ কিরূপে সৃজিত হইতেছে। সে নিজের অংশটুকু জানে মাত্র, সমস্তটার সহিত যোগটুকু জানে না। কাজেই সে মনে করিল, আমার পালা সাঙ্গ হইল এবং সমস্তই সাঙ্গ হইল।

প্রত্যহ যে শত সহস্র অভিনেতা, সামা-ন্যই হউক আর মহৎই হউক, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতেছে ও নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, সকলেই সেই

মহা উপাখ্যানের সহিত জড়িত, কেহ অধিক, কেহ অল্প; কেহ বা নিজের অভিনয়াংশের সহিত সাধারণ উপাখ্যানের যোগ কিয়ৎপরিমাণে জানে, কেহ বা একেবারেই জানে না। মনে কর, এই মহানাটকের "ফরাশী বিপ্লব" নামক একটা গর্ভাঙ্ক অভিনয় হইয়া গেল, কত শত বৎসর ধরিয়া কত শত রাজা হইতে কত শত দীনতম ব্যক্তি না জানিয়া না শুনিয়া ইহার অভিনয় করিয়া আসিতেছে; তাহাদের প্রত্যেকের জীবন পৃথক করিয়া পড়িলে এক একটি প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সমস্তটা একত্র করিয়া পড়িবার ক্ষমতা থাকিলে প্রকাণ্ড একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নাটক পড়া যায়। একবার কল্পনা করা যাক্, পৃথিবীর বহির্ভাগে দেবতারা সহস্র তারকা-নেত্র মেলিয়া এই অভিনয় দেখিতেছেন। কি আগ্রহের সহিত তাঁহারা চাহিয়া

রহিয়াছেন! প্রতি শতাব্দীর অঙ্কে অঙ্কে উপাখ্যান একটু একটু করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রতি দৃশ্য পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের কত প্রকার কল্পনার উদয় হইতেছে, কত কি অনুমান করিতেছেন! যদি পূর্ব্ব হইতেই এই কাব্য, এই নাটক পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলেও কি ব্যগ্রতার সহিত প্রত্যেক অভিনয়ের ফল দেখিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন! যেখানে একটা ঔৎসুক্যজনক গর্ভাঙ্ক আসন্ন হইয়াছে, সেই খানে তাঁহারা আগ্রহরুদ্ধ নিঃশ্বাসে মনে মনে বলিতে থাকেন এইবার সেই মহা-ঘটনা ঘটিবে। কি মহান্ অভিনয়! কি বিচিত্র দৃশ্য! কি প্রকাণ্ড রঙ্গবেদী!

খাঁটি বিনয়।

ভাল জহরী নহিলে খাঁটি বিনয় চিনিতে পারে না। একদল অহঙ্কারী আছে তাহারা অহঙ্কার করা আবশ্যক বিবেচনা করে না। তাহাদের বিস্তৃত জমিদারী, বিস্তর লোকের নিকট হইতে যশের খাজনা আদায় হয়, এই নিমিত্ত তাহাদের বিনয় করিবার উপযুক্ত সম্বল আছে। তাহারা সখ্ করিয়া বিনয় করিয়া থাকে। বাহিরে না কি জমিজমা যথেষ্ট আছে এই জন্য বাড়ির সম্মুখে একখানা বিনয়ের বাগান করিয়া রাখে। যে বেচারীর জমিদারী নাই, আধ পয়সা খাজনা মিলে না, সে ব্যক্তি পেটের দায়ে নিজের বাড়ির উঠানে, "অহং"-এর বাস্তু ভিটার উপরে অহ-ঙ্কারের চাষ করিয়া থাকে, তাহার আর সখ্ করিবার জায়গা নাই। নিজমুখে অহঙ্কার করিলে

যে দারিদ্র্য প্রকাশ পায়, সে দারিদ্র্য ঢাকিতে পারে এত বড় অহঙ্কার ইহাদের নাই। যাহা হউক, ইহাদের মধ্যে এক দল সখ করিয়া বিনয়ী, আর এক দল দায়ে পড়িয়া অহঙ্কারী ; উভয়ের মধ্যে প্রভেদ সামান্য।

নিজের গুণহীনতার বিষয়ে অনভিজ্ঞ এমন নির্গুণ শতকরা নিরেনব্বই জন, কিন্তু নিজের গুণ একেবারে জানে না, এমন গুণী কোথায়? তবে, চব্বিশ ঘণ্টা নিজের গুণগুলি চোখের সাম্‌নে খাড়া করিয়া রাখে না এমন বিনয়ী সংসারে মেলে। অতএব কে বিনয়ী? না, যে আপনাকে ভুলিয়া থাকে, যে আপনাকে জানে না তাহার কথা হইতেছে না।

বড় মানুষ গৃহকর্ত্তা নিমন্ত্রিতদিগকে বলেন, "মহাশয়, দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন ; আপনাদিগকে আজ বড় কষ্ট দেওয়া হইল"

ইত্যাদি। সকলে বলে, "আহা মাটির মানুষ!" কিন্তু ইহারা কি সামান্য অহঙ্কারী! অপ্রস্তুত হইলে লোকে যে কারণে কাঁদে না, হাসে; ইহারাও সেই কারণে বিনয় বাক্য বলিয়া থাকে। ইহারা কোন মতেই ভুলিতে পারে না, যে, ইহাদের বাসস্থান প্রাসাদ; কুটীর নহে। এ অহঙ্কার সর্ব্বদাই ইহাদের মনে জাগরুক থাকে। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে সারাক্ষণ শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়, পাছে বিনয়ের অভাব প্রকাশ পায়। অভ্যাগত আসিলেই তাড়াতাড়ি ডাকিয়া বলিতে হয়, মহাশয়, এ কুটীর, প্রাসাদ নহে। তেমন বৃষ যদি কেহ থাকে তবে এই অহঙ্কারী মশাদের বলে, বাপুহে, তুমি যে এতক্ষণ আমার শিঙ্গে বসিয়াছিলে, তাহা আমি মূলে জানিতেই পারি নাই, ভোঁ ভোঁ করিতে আসিয়াছ বলিয়া এতক্ষণে টের পাইলাম। তোমার এ বাড়িটা প্রাসাদ কি

কুটীর, সে বিষয়ে আমি মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিও নাই, আমার নজরেই পড়ে নাই, অতএব ও কথা তুলিবার আবশ্যক কি? আমাদের দেশে উক্ত প্রকার অহঙ্কারী বিনয়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সুকণ্ঠ বলেন "আমার গলা নাই," সুলেখক বলেন "আমি ছাই ভস্ম লিখি," সুরূপসী বলেন "এ পোড়ামুখ লোকের কাছে দেখাইতে লজ্জা করে!" এ ভাবটা দূর হইলেই ভাল হয়। ইহাতে না অহঙ্কার ঢাকা পড়ে, না সরলতা প্রকাশ হয়। আর এই সামান্য উপায়েই যদি বিনয় করা যাইতে পারে, তবে ত বিনয় খুব শস্তা!

আসল কথা এই যে, "বিনয় বচন" বলিয়া একটা পদার্থ মূলেই নাই। (বিনয়ের মুখে কথা নাই, বিনয়ের অর্থ চুপ করিয়া থাকা। বিনয় একটা অভাবাত্মক গুণ।) আমার যে অহঙ্কারের

বিষয় আছে এইটে না মনে থাকাই বিনয়, আমাকে যে বিনয় প্রকাশ করিতে হইবে, এইটে মনে থাকার নাম বিনয় নহে। যে বলে আমি দরিদ্র, সে বিনয়ী নহে; যে স্বভাবতই প্রকাশ করে না যে, আমি ধনী, সেই বিনয়ী। যাহার বিনয়-বাক্য বলিবার আবশ্যক পড়ে না সেই বিনয়ী। তবে কি না, বিদেশী ভাষা শিখিতে হইলে, ব্যাকরণ পড়িতে হয়, অভিধান মুখস্থ করিতে হয়; বিনয় যাহাদের পক্ষে বিদেশী, তাহাদিগকে বিনয়ের অভিধান মুখস্থ করিতে হয়। কিন্তু এই প্রকার মুখস্থ বিনয় সংসারের এক্‌জামিন পাশ করিতেই কাজে দেখে, পরীক্ষাশালার বাহিরে কোন কাজে লাগে না।

ধরা কথা।

সমস্ত জীবন যে তত্ব গুলিকে জানিয়া আসিতেছি, মাঝে মাঝে তাহাদের এক একবার আবিষ্কার করিয়া ফেলি। তাড়াতাড়ি পাশের লোককে ডাকিয়া বলি, ওহে, আমি এই তত্বটি জানিয়াছি। সে বিরক্ত হইয়া বলে, আঃ, ওত জানা কথা! কিন্তু ঠিক জানা কথা নয়। তুমি উহা জান' বটে তবুও জান না। একটা তুলনা দিলে স্পষ্ট হইবে। বাতাস সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তথাপি এক জন যদি বলিয়া উঠে, ওহে, এই খানে বাতাস আছে, তবে তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না, তেমনি আমরা যে সকল সাধারণ তত্বের মধ্যে বাস করিয়া থাকি, সেই তত্বগুলি অবস্থাবিশেষে এক এক জনের গায়ে লাগে, অমনি সে বলে, অমুক তত্বটি পাই-

তেছি। এক জন বন্ধু বলিতেছিলেন যে, আজ কাল সার্ব্বজনীন-উদারতা (Humanity) প্রভৃতি কতকগুলি প্রশস্ত কথা উঠিয়াছে, সহসা মনে হয়, কত কি মূল্যবান্ তত্ব উপার্জ্জন করিতেছি, কিন্তু সে সকল তত্ব বাতাসের মত। বাতাস অত্যন্ত উপকারী পদার্থ বটে, কিন্তু এত সাধারণ যে তাহার কোন মূল্য নাই। তেমনি উপরি-উক্ত তত্বগুলি বড় বড় তত্ব বটে, কিন্তু এত সাধারণ যে তাহার কোন মূল্য নাই; অথচ আজকাল তাহাদের এমনি বিশেষ রূপে উত্থাপিত করা হইতেছে যে, যেন তাহারা কতই অসাধারণ! তাঁহার কথাটা ঠিক মানি না। মহাত্মাদিগের "বসুধৈব কুটুম্বকং," এ কথাটি সকলই জানেন, অথচ সকলের গায়ে লাগে না। এ তত্বটি মাঝে মাঝে এক এক জনের গায়ে প্রবাহিত হয় অমনি সে বসুধৈব কুটুম্বকং প্রচার করিয়া

বেড়ায়। পুরাণো কথা ধরাকথা পারত-পক্ষে কেহ বলিতে চাহে না; অতএব পুরাণো কথা যখন কাহারো মুখে শুনা যায়, তখন বিবেচনা করা উচিত, সে তাহা জানিত বটে কিন্তু আজ নূতন পাইয়াছে, আমাদের ভাগ্যে এখনো তাহা ঘটে নাই। অনেক "উড়ো-কথা"র অপেক্ষা ধরা কথাকে আমরা কম জানি। আমরা নিজের চোক দেখিতে পাই না, দর্পণ পাইলেই দেখিতে পাই; ধরা কথা ধরিতে পারি না, বিশেষ অভিজ্ঞতা পাইলে ধরি। অতএব যাহারা জানা-কথা জানে, তাহারা সাধারণের চেয়ে অধিক জানে।

অন্ত্যেষ্টি সৎকার।

ইংরাজশাসন-বিদ্বেষী একদল লোক ক্রোধভরে বলেন—দেখ দেখি ইংরাজের কি অন্যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া তাহার সভ্যতা; ভারতবর্ষের বিষয় পাইয়া সে ধনী; অথচ সেই ভারতবর্ষের প্রতি তাহার কি অন্যায় ব্যবহার! আমার বক্তব্য এই যে তাহারা ত ঠিক উত্তরাধিকারীর মত কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষের মুখাগ্নি করিতেছে, ভারতবর্ষের শ্রাদ্ধ করিতেছে, আরও কি চাও! ভূত ভারতবর্ষ যখন মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে উপদ্রব করিতেছিল, তখন বড় বড় কামান-গোলার পিণ্ডদান করিয়া তাহাকে একেবারে শান্ত করিয়াছে। তাহা ছাড়া শাস্ত্রে বলে, নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করিয়া লোকে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। চিত্রগুপ্তের ছোট-আদালত হইতে এ ঋণের জন্য ইংরাজের নামে বোধ করি কোন কালে ওয়ারেণ্ট্ বাহির হইবে না। যে দেশে, যেখানে চরিবার প্রশস্ত মাঠ পাইয়াছে, Jane Cow (John Bull এর স্ত্রীলিঙ্গ)

সেই খানেই নিজের সন্তানগুলিকে চরাইয়া ও পরের সন্তানগুলিকে গুঁতাইয়া বেড়াইতেছে। অতএব উত্তরাধিকারীর ও পূর্ব্ব পুরুষের কর্ত্তব্য সাধনে তাহাদের কোন প্রকার শৈথিল্য লক্ষিত হইতেছে না। তবে তোমার নালিশ কি লইয়া?

দ্রুত বুদ্ধি।

অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকদের অনেকের সহসা নির্ব্বোধ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। তাহার কারণ—বুঝিবার পদ্ধতিকে, বুঝিবার ক্রম-বিশিষ্ট সোপান গুলিকে অনেকে বুঝা মনে করেন। এই উভয়কে তাঁহারা স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারেন না, একত্র করিয়া দেখেন। যাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যুতের মত, বজ্রবেগে যাঁহাদের মাথায় ভাব আসিয়া

পড়ে ; যাঁহাদের বুঝার সোপান দেখা যায় না, কঙ্কাল দেখা যায় না, ইঁট ও মালমসলাগুলা দেখা যায় না, কেবল বুঝাটাই দেখা যায়, সাধারণ লোকেরা তাঁহাদের নির্ব্বোধ মনে করে, কারণ তাহারা তাঁহাদের বুঝাকে বুঝিতে পারে না। যাদুকরেরা যাহা করে, তাহা যদি আস্তে আস্তে করে, তাহার প্রতি অঙ্গ যদি দেখাইয়া দেখাইয়া করে তবে দর্শক বেচারীরা সমস্ত বুঝিতে পারে। নহিলে তাহাদের ভেবাচেকা লাগিয়া যায়, কিছুই আয়ত্ত করিতে পারে না ও সমস্তই ইন্দ্রজাল বলিয়া ঠাহরায়। অসাধারণ বুদ্ধির এক দোষ এই যে, সে বুঝিতে যেমন পারে, বুঝাইতে তেমন পারে না। বুঝাইবে কিরূপে বল? নিজে সে একটা বিষয় এত ভাল জানে ও এত সহজে জানে যে, তাহাকেও আবার কি করিয়া সহজ করিতে হইবে ভাবিয়া পায় না। ইহারা আপনাকে অপেক্ষাকৃত

নির্ব্বোধ না করিয়া ফেলিলে অন্যকে বুঝাইতে পারে না। ইহাদের বুদ্ধি একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবামাত্র আবার তাহাকে সেখান হইতে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিতে হয়, যে পথ দিয়া বিদ্যুৎবেগে সে সেই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই পথ দিয়া অতিধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হয়, সে ব্যক্তি অভ্যাস দোষে মাঝে মাঝে ছুটিয়া চলিতে চায়, অমনি তাহাকে পাক্‌ড়া করিয়া বলিতে হয়—"আস্তে!" কেহ বা ইচ্ছা করিলে এইরূপ নির্ব্বোধ হইতে পারে, কেহ বা পারে না। অনেকের বুদ্ধি কোন মতেই রাশ মানে না, তাহাকে আস্তে চালাইবার সাধ্য নাই। এইরূপ লোকদের নির্ব্বোধ লোকেরা নির্ব্বোধ মনে করে। যাহারা স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়-টানা নৌকায় যায়, তাহারা প্রতি ঝাঁকানীতে প্রতি দাঁড়ের শব্দে বুঝিতে পারে যে,

নৌকা অগ্রসর হইতেছে। যাহারা পালের নৌকায় চলে, তাহারা সকল সময়ে বুঝিতে পারে না নৌকা চলিতেছে কি না।

লজ্জা ভূষণ।

সামাজিক লজ্জা বা অপরাধের লজ্জার কথা বলিতেছি না—আমি যে লজ্জার কথা বলিতেছি, তাহাকে বিনয়ের লজ্জা বলা যায়। তাহাই যথার্থ লজ্জা, তাহাই শ্রী। তাহার একটা স্বতন্ত্র নাম থাকিলেই ভাল হয়।

সম্বাদ পত্রে দোকানদারেরা যেরূপ বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেয়, যে ব্যক্তি নিজেকে সমাজের চক্ষে সেইরূপ বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেয়; সংসারের হাটে বিক্রেয় পুঁতুলের মত সর্ব্বাঙ্গে রঙ্‌চঙ্‌ মাখাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে; "আমি"

বলিয়া ডুটা অক্ষরের নামাবলী গায়ে দিয়া রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়াইতে পারে ; সেই ব্যক্তি নির্লজ্জ। সে ব্যক্তি তাহার ক্ষুদ্র পেখমটি প্রাণপণে ছড়াইতে থাকে, যাহাতে করিয়া জগতের আর সমস্ত দ্রব্য তাহার পেখমের আড়ালে পড়িয়া যায়, ও দায়ে পড়িয়া লোকের চক্ষু তাহার উপরে পড়ে। সে চায়—তাহার পেখমের ছায়ায় চন্দ্রগ্রহণ হয়, সূর্য্যগ্রহণ হয়, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গ্রহণ লাগে। যে লোক গায়ে কাপড় দেয় না, তাহাকে সকলে নির্লজ্জ বলিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি গায়ে অত্যন্ত কাপড় দেয়, তাহাকে কেন সকলে নির্লজ্জ বলে না ? যে ব্যক্তি রংচঙে কাপড় পরিয়া হীরা জহরতের ভার বহন করিয়া বেড়ায়, তাহাকে লোকে অহঙ্কারী বলে। কিন্তু তাহার মত দীনহীনের আবার অহঙ্কার কিসের ? যত লোকের চক্ষে সে পড়িতেছে,

তত লোকের কাছেই সে ভিক্ষুক। সে সকলের কাছে মিনতি করিয়া বলিতেছে, "ওগো এই দিকে! এই দিকে। আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ!" তাহার রঙচোঙে কাপড় গলবস্ত্রের চাদরের অপেক্ষা অধিক অহঙ্কারের সামগ্রী নহে।

আমাদের শাস্ত্রে যে বলিয়া থাকে "লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ," সে কি ভাসুরের সাক্ষাতে ঘোমটা দেওয়া, না শ্বশুরের সাক্ষাতে বোবা হওয়া? "লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ" বলিলে বুঝায়, অধিক ভুষণ না পরাই স্ত্রীলোকের ভূষণ। অর্থাৎ লজ্জাভূষণ গায়ে পরিলে শরীরে অন্য ভূষণের স্থান থাকে না। দুঃখের বিষয় এই যে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের অন্য সকল ভূষণই আছে, কেবল লজ্জা ভূষণটাই কম। রঙচং করিয়া নিজেকে বিক্রেয় পুত্তলিকার মত সাজাইয়া তুলিবার প্রবৃত্তি তাহাদের অত্যন্ত অধিক। লজ্জার

ভূষণ পরিতে চাও ত রং মোছ, শুভ্র বস্ত্র পরিধান কর, ময়ূরের মত পেখম তুলিয়া বেড়াইও না। উষা কিছু অন্তঃপুরবাসিনী মেয়ে নয়, তাহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশ হয়। কিন্তু সে এমনি একটি লজ্জার বস্ত্র পরিয়া, নিরলঙ্কার শুভ্র বসন পরিয়া জগতের সমক্ষে প্রকাশ পায়, ও তাহাতে করিয়া তাহার মুখে এমনি একটি পবিত্র, বিমল প্রশান্ত শ্রী প্রকাশ পাইতে থাকে যে, বিলাস-আবেশময় প্রমোদ উচ্ছ্বাস উষার ভাবের সহিত কোন মতে মিশ খায় না—মনের মধ্যে একটা সম্ভ্রমের ভাব উদয় হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জা কেবল মাত্র ভূষণ নহে, ইহা তাহাদের বর্ম্ম।

ঘর ও বাসাবাড়ি।

দশের চোখের উপরে যে দিন রাত্রি বাস করিতে চাহে, পরের চোখের উপরেই যাহার বাড়ি ঘর, তাহার আর নিজের ঘর বাড়ি নাই। সেই জন্যই সে রং চং দিয়া পরের চোখ কিনিতে চায়, সেখান হইতে ভ্রষ্ট হইলেই সে ব্যক্তি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহারা বাসাড়ে লোক, খাম্‌খেয়ালী ঘরওয়ালা উচ্ছেদ করিয়া দিলে ইহাদের আর দাঁড়াইবার জায়গা থাকে না। কিন্তু ভাবুক লোকদিগের নিজের একটা ঘর বাড়ি আছে, পরের চোখ হইতে বিদায় হইয়া তাহার সেই নিজের ঘরের মধ্যে আসিলেই সে যেন বাঁচে। ভাবুক লোকেরা যথার্থ গৃহস্থ লোক। আর যাহারা নিজের মনের মধ্যে আশ্রয় পায় না, তাহারা কাজেই পরের চক্ষু অবলম্বন করিয়া থাকে

ও রং-চং মাখিয়া পরের চক্ষুর খোষামোদ করিতে থাকে। ভাবুকদিগের নিজের মনের মধ্যে কি অটল আশ্রয় আছে! এই জন্যই দেখা যায়, ভাবুক লোকেরা বাহিরের লোক জনের সহিত বড় একটা মিশিতে পারেন না, কণ্ঠাগ্র ভদ্রতার আইন কানুনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন না। যেখানে চল্লিশ জন অলস ভাবে হাসিতেছে, সেখানে তিনি একচল্লিশ হইয়া তাহাদের সহিত একত্রে দন্ত বিকাশ করিতে পারেন না। দশ ব্যক্তির মধ্যে একাদশ হইবার ঐকান্তিক বাসনা তাঁহার নাই।

নিরহঙ্কার আত্মম্ভরিতা।

কেনই বা থাকিবে? তিনি নিজের কাছে নিজে সর্ব্বদাই সম্ভ্রমে নত হইয়া থাকেন।

তাঁহার নিজের সহচর নিজেই। অত বড় সহচর দশের মধ্যে কোথায় মিলিবে? প্রতিভা যখন মুহূর্ত্ত কালের জন্য অতিথি হইয়া একজন কবিকে বীণা করিয়া তাঁহার তন্ত্রী হইতে সুর বাহির করিতে থাকে, তখন তিনি নিজের সুর শুনিয়া নিজে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। বাল্মীকি তাঁহার নিজের রচিত রামকে যেমন ভক্তি করিতেন, এমন কোন ভক্ত করেন না, এবং যতক্ষণ তিনি রামের চরিত্র সৃজন করিতেছিলেন, ততক্ষণ তিনি নিজেই রাম হইয়াছিলেন ও তাঁহার নিজের মহান্ ভাবে নিজেই মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে যাঁহারা নিজেকে নিজেই ভক্তি করিতে পারেন, নিজের সাহচর্য্যে নিজে সুখ ভোগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর দশ জনের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয় না। এক কথায়—যাঁহারা একলা থাকেন, তাঁহারা আর পরের সহিত

মিশিবার অবসর পান্ না। ইহাকেই বলে অহঙ্কার-বিবর্জ্জিত আত্মম্ভরিতা।

আত্মময় আত্ম-বিস্মৃতি।

কিন্তু ইহা বলিয়া রাখি, ভাবুক লোকদিগের নিজের প্রতি মনোযোগ দিবার যেমন অল্প অবসর ও আবশ্যক আছে, এমন আর কাহারো নহে। যাহাদের পরের সহিত মিশিতে হয়, তাহাদের যেমন চব্বিশ ঘণ্টা নিজের চর্চ্চা করিতে হয়, এমন আর কাহাকেও না। তাহাদের দিন রাত্রি নিজেকে মাজিতে ঘষিতে, সাজাইতে গোজাইতে হয়। পরের চোখের কাছে নিজেকে উপাদেয় করিয়া উপহার দিতে হয়। এইরূপে যাহারা পরের সহিত মেশে নিজের সহিত তাহাদের অধিকতর মিশিতে হয়। ইহারাই যথার্থ

আত্মম্ভরী। ভাবুকগণ কবিগণ সর্ব্বদাই নিজেকে ভুলিয়া থাকেন। কারণ তাঁহার নিজেকে মনে করাইয়া দিবার জন্য পর কেহ উপস্থিত থাকে না। নিজের সহিত ব্যতীত আর কাহারো সহিত ইহাঁরা ভাল করিয়া মেশেন না বলিয়া ইহাঁরা নিজের কথা ভাবেন না। ইহাঁরাই যথার্থ আত্মময় আত্ম-বিস্মৃত।

ছোট ভাব।

বর্ত্তমান সভ্যতার প্রাণপণ চেষ্টা এই যে, কিছুই ফেলা না যায়, সকলই কাজে লাগে। মনোবিজ্ঞান একটা ক্ষুদ্র বালকের একটা বদ্ধ পাগলের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম চিন্তা, খেয়াল, মনোভাব সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়, কাজে লাগিবে। সমাজ বিজ্ঞান, শিশু সমাজের, অসভ্য

সমাজের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান, অর্থহীন প্রথা, পুঁথিতে জমা করিয়া রাখিতেছে, কাজে লাগিবে। এখনকার কবিরাও এমন সকল ক্ষুদ্র যৎসামান্য বিষয়গুলিকে কবিতায় পরিণত করেন, যাহা প্রাচীন লোকেরা গদ্যেরও অনুপযুক্ত মনে করিতেন। এখনকার শিল্পেও যাহা সাধারণ লোকে অনাবশ্যক, পুরাণ, গলিত বলিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহাও একটা না একটা কাজে খাটিয়া যাইতেছে।

আমরা যখন, বেড়াইতেছি, শুইয়া আছি, আহার করিতেছি, সংসারের ছোটখাট খুঁটিনাটি কাজ সমাধা করিতেছি, তখন আমাদের মনের মধ্যে কত শত খুচ্‌রা বাজে ভাব আনাগোনা করিতে থাকে, সে গুলিকে আমরা নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া আবর্জ্জনা মনে করিয়া ফেলিয়া দিই। খুব একটা দীর্ঘপ্রস্থ ভাব নহিলে আমরা তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করি না। আমরা আ-

মাদের মনের মধ্যে যে জাল পাতিয়া রাখি, তাহা বড় মাছ ধরিবার জাল; ছোট ছোট মাছেরা তাহার ছিদ্রের মধ্য দিয়া গলিয়া পালাইয়া যায়। কিন্তু এমনতর অমনোযোগিতা এ কালের রীতি-বহির্ভূত। ঐ ছোট ভাব ধরিয়া জিয়াইয়া রাখিলে কত বড় হইত কে বলিতে পারে। একবার হাতছাড়া হইলে বড় হইয়া আবার যে তোমাকে ধরা দিবে তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। তাহা ছাড়া, আয়তন লইয়া আবশ্যক স্থির করে বালকেরা। সমাজের যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই এ বিষয়ে তাহার উন্নতি দেখা যাইতেছে। আমার একটি বন্ধু আছেন, তিনি অতি সাবধানে তাঁহার মনের দ্বার আগলাইয়া বসিয়া আছেন, যখনি ভাব আসে, তখনি পাক্‌ড়া করেন, তাহাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখেন; ভাবিতে থাকেন, ইহাকে কোন প্রকারে মাজিয়া ঘষিয়া ছাঁটিয়া

বাড়াইয়া কমাইয়া অক্ষরে লিখিবার উপযোগী করিতে পারি কি না। এই উপায়ে ইহাঁর এমনি হাত পাকিয়া গিয়াছে, যে, তুমি যে ভাব ব্যবহার করিয়া বা ব্যবহারের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেও, তাহাই লইয়া দুই দণ্ডের মধ্যে ইনি ব্যবহারের জিনিষ বা ঘর সাজাইবার খেলেনা গড়িয়া দিতে পারেন। লোকের অব্যবহার্য্য ভাঙ্গাকাঁচের টুক্‌রা কুড়াইয়া কারীগরেরা ফানুষ গড়ে; ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া লইয়া কাগজ গড়ে। আমার বন্ধুর প্রবন্ধগুলি সেইরূপ। তাহাদের মূল উপকরণ অনুসন্ধান করিতে যাও, দেখিবে ভাবের আবর্জ্জনা, ছিন্ন টুকুরা, অব্যবহার্য্য চিন্তাখণ্ড লইয়া সমস্ত গড়িয়াছেন।

সকলের প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, কোন ভাব বিবেচনা না করিয়া যেন ফেলা না যায়। অনবরত এইটে যেন মনে করেন, এ ভাবটাকে

কোন প্রকারে লিখিয়া ফেলিতে পারি কি না! যাহা কিছু মনে আসে, সমস্ত ভাব লিখিয়া রাখা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব অবিরত যেন, হাতুড়ি, বাটালি, পালিষ করিবার যন্ত্রাদি হাতের কাছে মজুত থাকে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, আমাদের মনে যত প্রকার ভাব উঠে, সকল গুলিই লিখিবার উপযুক্ত। কিন্তু অতবড় লেখক হইবার উপযুক্ত প্রতিভা আমাদের নাই। বড় বড় কবিদিগের লেখা দেখিয়া আমরা অধিকাংশ সময়ে এই বলিয়া আশ্চর্য্য হই যে, "এ ভাবটা আমার মনে কত শতবার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু আমিত স্বপ্নেও মনে করি নাই, এ ভাবটাও আবার এমন চমৎকার করিয়া লেখা যায়!" অনেকের মনে ভাব আছে, অথচ ভাব ধরা দেয় না, ভাব পোষ মানে না; ভাবের ভাব বুঝিতে পারা যায় না। আইস, আমরা অনবরত বুঝিতে চেষ্টা করি।

মনোরাজ্যে এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া লই যে, বাজে খরচ না হয়। কাহারো কি আশ্চর্য্য মনে হয় না যে কেবল মাত্র বেবন্দোবস্তের দরুণ প্রত্যহ কত হাজার হাজার ভাব নিস্ফল খরচ হইয়া যাইতেছে। তাহার হিসাব পর্য্যন্ত রাখা হইতেছে না। এক জন লেখক ও এক জন অলেখকের মধ্যে শুদ্ধ কেবল এই বন্দোবস্তের প্রভেদ লইয়া প্রভেদ। একজন তাঁহার ভাব খাটাইয়া কারবার করেন, আর এক ব্যক্তির এই ভাবের টাকাকড়ির বিষয়ে এমনি গোলমেলে মাথা, যে, কোন্ দিক্ দিয়া যে সমস্ত খরচ হইয়া যায়, উড়িয়া যায়, তাহার ঠিকানা করিতে পারেন না।

—

জগতের জন্ম মৃত্যু।

কত অসংখ্য, কত বিচিত্র জগৎ আছে, তাহা একবার মনোযোগ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখা হউক্ দেখি! আমার কথা হয় ত অনেকে ভুল বুঝিতেছেন। অনেকে হয় ত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র একটি একটি গণনা করিয়া জগতের সংখ্যা নিরূপণ করিতেছেন। কিন্তু আমি আর এক দিক হইতে গণনা করিতেছি। জগৎ একটি বই নয়। কিন্তু প্রতি লোকের এক একটি যে পৃথক জগৎ আছে, তাহাই গণনা করিয়া দেখ দেখি! কত সহস্র জগৎ! আমি যখন রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছটফট্ করিতেছি তখন কেন জ্যোৎস্নার মুখ ম্লান হইয়া যায়, উষার মুখেও শ্রান্তি প্রকাশ পায়, সন্ধ্যার হৃদয়েও অশান্তি বিরাজ করিতে থাকে? অথচ সেই মুহূর্ত্তে কত শত লোকের কত

শত জগৎ আনন্দে হাসিতেছে, কত শত ভাবে তরঙ্গিত হইতেছে। না হইবে কেন? আমার জগৎ যতই প্রকাণ্ড, যতই মহান্ হউক্ না কেন, "আমি" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালুকণার উপর তাহার সমস্তটা গঠিত। আমার সহিত সে জন্মিয়াছে, আমার সহিত সে লয় পাইবে। সুতরাং আমি কাঁদিলেই সে কাঁদে, আমি হাসিলেই সে হাসে। তাহার আর কাহাকেও দেখিবার নাই, আর কাহারও জন্য ভাবিবার নাই। তাহার লক্ষ তারা আছে, কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার জন্য। একজন লোক যখন মরিয়া গেল, তখন আমরা ভাবি না যে একটি জগৎ নিভিয়া গেল। একটি নীলাকাশ গেল, একটি সৌরপরিবার গেল, একটি তরুলতা-পশুপক্ষীশোভিত পৃথিবী গেল।

অসংখ্য জগৎ।

উপরের কথাটাকে আরো একটু বিস্তৃত করা যাক। একজন লোক মরিয়া গেল, আমরা সাধারণতঃ মনে করি, সেই গেল, তাহার সহিত আর কিছু গেল না। এরূপ ভ্রমে পড়িবার প্রধান কারণ এই যে, আমরা সচরাচর মনে করি যে, সেও যে জগতে আছে আমরাও সেই জগতে আছি, সেও যাহা দেখিতেছে, আমরাও তাহাই দেখিতেছি। কিন্তু সেই অনুমানটাই ভ্রম না কি, এই নিমিত্ত সমস্ত যুক্তিতে ভ্রম পৌঁছিয়াছে। সে যাহা দেখিতেছে, আমরা তাহা দেখিতেছি না, সে যেখানে আছে, আমরা সেখানে নাই। সে দেখিতেছে, ভাগীরথী পতি-মিলনাশয়ে চঞ্চলা যুবতীর ন্যায় নৃত্য করিতেছে, গান গাইতেছে; আমি দেখিতেছি ভাগীরথী স্নেহময়ী মাতার ন্যায়

তটভূমিকে স্তনপান করাইতেছেন, তরঙ্গ-হস্তে অনবরত তাহার ললাটে অভিঘাত করিয়া কল-কণ্ঠে বৈচিত্র্যহীন ঘুম পাড়াইবার গান গাহিতে-ছেন। উভয় জগতের উভয় জাহ্নবীর মধ্যে এত প্রভেদ। এই প্রকার, যত লোক আছে সকল লোকেরই জগৎ স্বতন্ত্র। লোক অর্থে, মনুষ্য-বিশেষ এবং লোক অর্থে জগৎ বুঝায়। অর্থাৎ একজন মনুষ্য বলিলে একটি জগৎ বলা হয়। আমি কে? না আমি যাহা কিছু দেখিতেছি—চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী ইত্যাদি—সমস্ত লইয়া এক জন। তুমিও তাহাই। অতএব প্রতি লোকের সঙ্গে সঙ্গে শত শত চন্দ্র সূর্য্য জন্মগ্রহণ করে ও শত শত চন্দ্র সূর্য্য মরিয়া যায়। অতএব দেখ, জগৎ যেমন অসংখ্য, তেমনি বিচিত্র। কাহারো জগতে সূর্য্যোদয় আছে, আঁধারের অপগমন ও আলোকের আগমন আছে, কিন্তু প্রভাত নাই।

সে ব্যক্তি সূর্য্যোদয় রূপ একটা ঘটনা দেখিতে পায় বটে, কিন্তু প্রভাত দেখিতে পায় না। প্রভাত শিশির, প্রভাত সমীরণ, প্রভাত মেঘমালা, প্রভাত অরুণ-রাগের সামঞ্জস্য দেখিতে পায় না; সুতরাং তাহার জগতে প্রভাত ব্যতীত প্রভাতের আর সমস্তই আছে। কাহারো বা প্রভাত আছে সন্ধ্যা নাই। বসন্ত আছে, শরৎ নাই। কাহারো জ্যোৎস্না হাঁসে, কাহারো জ্যোৎস্না কাঁদে। কাহারো জগতে টাকার ঝম্‌ঝম্ ব্যতীত সঙ্গীত নাই, মলের ঝম্‌ঝম্ ব্যতীত কবিতা নাই, উদরের বাহিরে সুখ নাই, ইন্দ্রিয়ের বাহিরে অস্তিত্ব নাই। এমন কত কহিব! এ সকল ত স্পষ্ট প্রভেদ; সূক্ষ্ম প্রভেদ কত আছে, তাহার নাম কে করিবে?

জগতের জমিদারী।

তুমি জমী কিনিতেই ব্যস্ত, জগতের জমিদারী বাড়াইতে মন দাও না কেন? তুমি ত মস্ত ধনী, তোমার অপেক্ষা একজন কবি ধনী কেন? তোমার জগতের অপেক্ষা তাঁহার জগৎ বৃহৎ। অত বড় জমী কাহার আছে? তিনি যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত দখল করিয়া বসিয়া আছেন। তোমার জগতের মানচিত্রে উত্তরে আফিসের দেয়াল, দক্ষিণে আফিসের দেয়াল, পূর্ব্বেও তাহাই, পশ্চিমেও তাহাই। কবিদিগের কাছে, জ্ঞানীদিগের কাছে বিষয় কর্ম্ম শেখ। তোমার জগৎ-জমিদারীর সীমা বাড়াইতে আরম্ভ কর। আফিসের দেয়াল অতিক্রম করিয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাও, দিগন্ত অতিক্রম করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যন্ত বেষ্টন কর, পৃথিবী অতিক্রম করিয়া

জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে যাও এবং সমস্ত জগৎ অতিক্রম করিয়া অসীমের দিকে সীমা অগ্রসর করিতে থাক। আমি ত দেখিতেছি (তোমার যতই জমি বাড়িতেছে, ততই জগৎ কমিতেছে। এ যে ভয়ানক লোকসানের লাভ)

অল্প দিন হইল, আমার এক বন্ধু গল্প করিতে-ছিলেন, যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, জগৎ নিলাম হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য বিকাইয়া যাইতেছে। বোধ করি যেন এমন নিলাম হইয়া থাকে। ভাবুকগণ বুঝি পূর্ব্বজন্মে চড়া দামে চন্দ্র সূর্য্য তারা, বসন্ত, মেঘ, বাতাস কিনিয়াছিলেন, আর আমরা একটা স্থূল উদর, স্থূল দৃষ্টি, ও স্থূল বুদ্ধি লইয়া নিজের ভারে এমনি অবনত হইয়া পড়িয়াছি, যে ইহার উপরে এই সাড়ে তিন হস্তের বহির্ভূত আর কিছু চাপাইবার ক্ষমতা নাই। নিজের বোঝা যতই ভারী বোধ হইতেছে, ততই আপনাকে ধনী মনে

করিতেছি। ইহা দেখিতেছি না কত লোক জগতের বোঝা অবলীলাক্রমে বহন করিতেছেন।

প্রকৃতি পুরুষ।

জগৎ সৃষ্টির যে নিয়ম, আমাদের ভাব সৃষ্টিরও সেই নিয়ম। মনোযোগ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, আমাদের মাথার মধ্যে প্রকৃতি পুরুষ দুই জনে বাস করেন। একজন ভাবের বীজ নিক্ষেপ করেন, আর একজন তাহাই বহন করিয়া পালন করিয়া, পোষণ করিয়া তাহাকে গঠিত করিয়া তুলেন। একজন সহসা একটি সুর গাহিয়া উঠেন, আর একজন সেই সুরটিকে গ্রহণ করিয়া, সেই সুরকে গ্রাম করিয়া, সেই সুরের ঠাটে তাঁহার রাগিণী বাঁধিতে থাকেন।

একজন সহসা একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র বিক্ষেপ করেন আর একজন সেই স্ফুলিঙ্গটিকে লইয়া ইন্ধনের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে ফুঁ দিয়া তাহাকে আগুন করিয়া তোলেন।

এমন অনেক সময় হয়, যখন আমাদের হৃদয়ে একটি ভাবের আদিম অস্ফুট মূর্ত্তি দেখা দেয়, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহাকে হয়ত বিসর্জ্জন দিয়াছি, তাহাকে হয়ত বিস্মৃত হইয়াছি, আমাদের চেতনার রাজ্য হইতে হয়ত সে একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে—অবশেষে বহু দিন পরে এক দিন সহসা সেই বিস্মৃত পরিত্যক্ত অস্ফুট ভাব, পূর্ণ আকার ধারণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া আমাদের চিত্তে বিকশিত হইয়া উঠে। সেই উপেক্ষিত ভাবকে এত দিন আমাদের ভাব-রাজ্যের প্রকৃতি যত্নের সহিত বহন করিতেছিলেন, পোষণ করিতে-ছিলেন, বুকে তুলিয়া লইয়া স্তন দান করিতে-

ছিলেন, অথচ আমরা তাহাকে দেখিতেও পাই নাই, জানিতেও পারি নাই। তেমনি আবার এমন অনেক সময় হয়, যখন আমাদের মনে হয়, একটি ভাব বিশেষ এই মাত্র বুঝি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইল, আমাদের হৃদয় রাজ্যে এই বুঝি তার প্রথম পদার্পণ, কিন্তু আসলে হয়ত আমরা ভুলিয়া গেছি, কিম্বা হয়ত জানিতেও পারি নাই, কখন্ সেই ভাবের প্রথম অদৃশ্য বীজ আমাদের হৃদয়ে রোপিত হয়—কিছুকাল পরিপুষ্ট হইলে তবে আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরা জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের নিজ-হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম বৃত্তিটি পর্য্যন্ত, কোন পদার্থের আদি মুহূর্ত্ত জানিতে পারি না আমাদের নিজের ভাবের আরম্ভও আমরা জানিতে পারি না; আমাদের চক্ষে যখন কোন পদার্থের আরম্ভ প্রতিভাত হইল, তাহার

পূর্ব্বেও তাহার আরম্ভ হইয়াছিল। এই জন্যই বুঝি, আমাদের মর্ত্ত্য হৃদয়ের স্বভাব আলোচনা করিয়া আমাদের পুরাতন ঋষিগণ সন্দেহ-আকুল হইয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

"অথ কো বেদ যত আবভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্ যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ স অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।"

কে জানে কি হইতে ইহা হইল। এই সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, কেহ ইহা সৃষ্টি করিয়াছে কি করে নাই। যিনি ইহার অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে আছেন, তিনি ইহা জানেন, অথবা জানেন না!

ঋষিদের সন্দেহ হইতেছে যে, যিনি ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও হয়ত জানেন না কোথায় এই সৃষ্টির আরম্ভ। কেন না ক্ষুদ্র

সৃষ্টিকর্ত্তা মানবেরাও জানে না, তাহাদের নিজের ভাবের আরম্ভ কোথায়, আদি কারণ কি।

এইরূপে সংসারের কোলাহলের মধ্যে, কাজ কর্ম্মের মধ্যে কত শত ভাব আমরা অদৃশ্য অলক্ষিত ভাবে নিঃশব্দে বহন করিয়া, পোষণ করিয়া বেড়াইতেছি, আমরা তাহার অস্তিত্বও জানি না। হয়ত এই মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়ে এমন একটি ভাবের বীজ নিক্ষিপ্ত হইল, যাহা অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত পরিপুষ্ট হইয়া নদীতীরস্থ দৃঢ়বদ্ধমূল বৃক্ষের ন্যায় নিজের অবস্থানভূমিকে প্রখর কালস্রোতের হস্ত হইতে বহু সহস্র বৎসর রক্ষা করিবে, যাহা তাহার ঘন-পল্লব শাখার অমরচ্ছায়ায় আমার নামকে বহু সহস্র বৎসর জীবিত করিয়া রাখিবে, অথচ আমি তাহার জন্ম দিন লিখিয়া রাখিলাম না, তাহার জন্ম মুহূর্ত্ত জানিতেও পারিলাম না তাহার জন্মকালে শঙ্খও বাজিল না, হুলুধ্বনিও উঠিল

না। আমরা যখন আহার করি তখন আমরা জানিতে পারি না, আমাদের সেই খাদ্যগুলি জীর্ণ হইয়া রক্ত রূপে কত শত শিরা উপশিরায় প্রধাবিত হইতেছে। তেমনি একজন ভাবুক যখন তাঁহার শত শত ভাব মস্তকে বহন করিয়া বিহঙ্গ-কূজিত, ফুল্লপুষ্প, শ্যামশ্রী বনের মধ্যে সূর্য্যালোকে বিচরণ করিতেছেন, ও স্বভাবের শোভা উপভোগ করিতেছেন, তখন তাঁহার ভাব রাজ্যের প্রকৃতি মাতা সেই সূর্য্যালোক, সেই বনের শোভাকে রক্ত রূপে পরিণত করিয়া অলক্ষিত ভাবে, তাঁহার শত সহস্র ভাবের শিরা উপশিরার মধ্যে প্রবাহিত করাইয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারেন না। যখন আমি একজন প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখি, তখন আমি ভাবি, যে, হয়ত ইনি এই মুহূর্ত্তে ভবিষ্যৎ শতাব্দীকে মস্তকে

পোষণ করিয়া বেড়াইতেছেন অথচ ইনি নিজেও তাহা জানেন না।

জগৎ-পীড়া।

জগৎ একটি প্রকাণ্ড পীড়া। অস্বাস্থ্যকে পরাভূত করিবার জন্য স্বাস্থ্যের প্রাণপণ চেষ্টাকে বলে পীড়া। জগতও তাহাই। জগতও অস্বাস্থ্যকে অতিক্রম করিয়া উঠিবার জন্য স্বাস্থ্যের উদ্যম। অভাবকে দূর করিবার জন্য পূর্ণতাকাঙ্ক্ষার উদ্যোগ। সুখ পাইবার জন্য অসুখের যোঝাযুঝি। জীবন পাইবার জন্য মৃত্যুর প্রযত্ন। অভিব্যক্তি-বাদ (Evolution Theory) আর কি বলে? জগতের নিকৃষ্টতম প্রাণ ক্রমশঃ মানুষে আসিয়া পরিণত হয়। জগতের নিকৃষ্টতম প্রাণীর

মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রাণীতে-পরিণত-হইবার চেষ্টা কার্য্য করিতেছে। অভিব্যক্তি-বাদকে প্রাণীজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে কেন? অভিব্যক্তি-বাদ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? না, কিছুই আকাশ হইতে পড়িয়া হয় না, প্রকৃতিতে কিছুরই হঠাৎ মাঝখানে আরম্ভ নাই। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে মানিতে হয় যে, আমরা যাহাকে প্রাণ বলি তাহারো হঠাৎ আরম্ভ নাই। আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহা হইতেই সে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ কথা যদি না মান, তবে "ঈশ্বর বলিলেন, পৃথিবী হউক্, অমনি পৃথিবী হইল" এ কথা মানিতেও আপত্তি করা উচিত নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক জড় পরমাণু প্রাণ হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম প্রাণ পূর্ণতর জীব হইতে চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক পূর্ণতর জীব, (যেমন মনুষ্য)

অপূর্ণতার হাত এড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বিশাল জগতের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে অভিব্যক্তির চেষ্টা অনবরত কার্য্য করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রোগের অর্থ অস্বাস্থ্য, কিন্তু সেই অস্বাস্থ্যের মধ্যে স্বাস্থ্যের ভাব কার্য্য করিতেছে। জগতের প্রত্যেক পরমাণু পীড়া, কিন্তু সেই প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে স্বাস্থ্যের নিয়ম সঞ্চারিত হইতেছে। এই নিয়ম বর্ত্তমান না থাকিলে জীবন থাকিতে পারে না। অতএব এই জগতের যে চেতনা, তাহা পীড়ার চেতনা। আমাদের যে অঙ্গে পীড়া হয়, সেই অঙ্গ যেমন একটি বিশেষ চেতনা অনুভব করে, তেমনি জগতের যে চেতনা, তাহা পীড়ার চেতনা। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক পরমাণু অনবরত অভাব-বোধ অনুভব করিতেছে। আমরা যে পীড়ার বেদনা অনুভব করি, তাহা আসলে খারাপ

নহে, তাহার অর্থই এই, যে, এখনো আমাদের স্বাস্থ্য আছে, এখনো সে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে নাই। সেইরূপ সমস্ত জগতের যে একটি বেদনা বোধ হইতেছে, তাহার প্রত্যেক পরমাণুতে যে অভাব অনুভূত হইতেছে, তাহার অর্থই এই যে, অভিব্যক্ত হইবার ক্ষমতা তাহার সর্ব্ব শরীরে কাজ করিতেছে। সুস্থ হইবার শক্তি জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। আপনাকে ধ্বংশ করিবার উদ্যোগই পীড়ার জীবন। সেই আত্মহত্যা পরায়ণতাই পীড়া। জগতও সেইরূপ। জগৎ, জগৎ হইতে চায় না। তাহার উন্নতির শেষ সীমা আত্মহত্যা। তাহার চেষ্টারও শেষ লক্ষ্য তাহাই। জগৎ সম্পূর্ণ হইতে চায়, আর এক কথায় জগৎ আরোগ্য হইতে চায়, অর্থাৎ জগৎ, জগৎ হইয়া থাকিতে চায় না। এই নিমিত্ত সমস্ত জগতের মধ্যে এবং জগতের ক্ষুদ্রতম পর-

মাণুর মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে, সমস্ত জগৎ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, এবং জগতের একটি পরমাণুও নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। এই অসন্তোষই বিশাল জগতের প্রাণ। বিজ্ঞান শাস্ত্র কাহাকে বলে? না, যে শাস্ত্র জগৎরূপ একটি মহাপীড়ার সমস্ত লক্ষণ, সমস্ত নিয়ম আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে। মনুষ্য দেহের একটি পীড়ার সমস্ত তথ্য জানিতে পারি না, আমরা জগৎ পীড়ার সমস্ত লক্ষণ জানিতে চাই। আমাদের কি আশা! আমাদের নিজ দেহের একটি পীড়াকে আমরা যদি সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সমস্ত জগৎ পীড়ার নিয়ম অবগত হইতে পারি। কারণ, এই নিয়ম সমস্ত জগৎ-সমষ্টিতে ও জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে কার্য্য করিতেছে। এই নিমিত্তই কবি টেনিসন্ কহিয়াছেন——

'Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies;—
Hold you here, root and all, in my hand
Little flower—but if I could understand,
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is.

ইহার অর্থ এই যে, জগৎকে জানাও যা, একটি তৃণকে জানাও তাই, জগতের প্রত্যেক পরমাণুই এক একটি জগৎ।

সমাপন।

লিখিলে লেখা শেষ হয় না। পুঁথি যে ক্রমেই বাড়িতে চলিল। আর, সকল কথা লিখিলেই বা পড়িবে কে? কাজেই এই খানেই লেখা সাঙ্গ করিলাম।

আমার ভয় হইতেছে, পাছে এ লেখাগুলি লইয়া কেহ তর্ক করিতে বসেন। পাছে কেহ প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতে আসেন। পাছে কেহ ইহাদের সত্য অসত্য আবশ্যক অনাবশ্যক উপকার অপকার লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন। কারণ, এ বই খানি সে ভাবে লেখাই হয় নাই।

ইহা, একটি মনের কিছু দিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সকলগুলি কি আমি মানি, না বিশ্বাস করি? সে গুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এই মাত্র। তাহারা সকল গুলিই সত্য, অর্থাৎ ইতিহাসের হিসাবে সত্য, যুক্তিতে মেলে কি না মেলে সে কথা আমি জানি না। যুক্তির সহিত না মিলিলে যে একেবারে কোন কথাই বলিব না এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে কি জানি পাছে এমন অনেক কথা

না বলা হয় যে গুলি আসলে সত্য! কি জানি, এমন হয়ত সূক্ষ্ম যুক্তি থাকিতে পারে, এমন অলিখিত তর্কশাস্ত্র থাকিতে পারে, যাহার সহিত আমার কথাগুলি কোন না কোন পাঠক মিলাইয়া লইতে পারেন! আর, যদি নাই পারেন্ ত সে গুলা চুলায় যাক্। তাই বলিয়া প্রকাশ করিতে আপত্তি কি?

আর চুলাতেই বা যাইবে কেন? মিথ্যাকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখ না, ভ্রমের বৈজ্ঞানিক দেহতত্ত্ব শিক্ষা কর না! (জীবিত দেহের নিয়ম জানিবার জন্য অনেক সময় মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়।) তেমনি অনেক সময়ে এমন হয় না কি, পবিত্র জীবন্ত সত্যের গায়ে অস্ত্র চালাইতে কোন মতে মন উঠে না, হৃদয়ের প্রিয় সত্যগুলিকে অসঙ্কোচে কাটাকাটি ছেঁড়াছেঁড়ি করিতে প্রাণে আঘাত লাগে, ও সেই জন্য মৃত ভ্রম, মৃত

মিথ্যাগুলিকে কাটিয়া কুটিয়া সত্যের জীবন-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হয়।)

আর, পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ গ্রন্থ মনের ইতিহাসের এক অংশ। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে মনের গঠন কার্য্য চলিতেছে। এই মহা শিল্পশালা এক নিমেষ কালও বন্ধ থাকে না। এই কোলাহলময় পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানবের অদৃশ্য অভ্যন্তরে অনবরত কি নির্ম্মাণ-কার্য্যই চলিতেছে! অবিশ্রাম কত কি আসিতেছে যাইতেছে, ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে, বর্দ্ধিত হইতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্য্যশীল পরিবর্ত্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিরোধী কথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবের নিবেশ থাকিতেও পারে। জীবনের লক্ষণই এইরূপ। একেবারে স্থৈর্য্য, সমতা,

ও ছাঁচে-ঢালা ভাব মৃতের লক্ষণ। এই জন্যই মৃত বস্তুকে আয়ত্তের মধ্যে আনা সহজ। চলন্ত, স্বাধীন, ক্রীড়াশীল জীবনকে আয়ত্ত করা সহজ নহে, সে কিছু দুরন্ত। জীবন্ত উদ্ভিদে আজ যে খানে অঙ্কুর, কাল সেখানে চারা, আজ দেখিলাম সবুজ কিশলয়, কাল দেখিলাম সে পীতবর্ণ পাতা হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, আজ দেখিলাম কুঁড়ি, কাল দেখিলাম ফুল, পরশু দেখিলাম ফল। আমার লেখাগুলিকেও সেই ভাবে দেখ। এই গ্রন্থে যে মত গুলি সবুজ দেখিতেছ, আজ হয়ত সেগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে। ইহাতে যে ভাবের ফুলটি দেখিতেছ, আজ হয়ত সে ফল হইয়া গিয়াছে দেখিলে চিনিতে পারিবে না। আমাদের হৃদয় বৃক্ষে প্রত্যহ কত শত পাতা জন্মিতেছে ঝরিতেছে, ফুল ফুটিতেছে শুকাই-তেছে—কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের শোভা

দেখিবে না? আজ যাহা আছে আজই তাহা দেখ, কাল থাকিবে না বলিয়া চোখ বুজিব কেন? আমার হৃদয়ে প্রত্যহ যাহা জন্মিয়াছে, যাহা ফুটিয়াছে, তাহা পাতার মত ফুলের মত তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলাম। ইহারা আমার মনের পোষণ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছে, তোমাদেরও হয়ত কাজে লাগিতে পারে!

আমি যখন লিখি তখন আমি মনে করি যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন তাঁহারাই আমার বই পড়িতেছেন। আমি যেন এককালে শত শত পাঠকের ঘরের মধ্যে বসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছি। আমি এই বঙ্গদেশের কত স্থানের কত শত পবিত্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি। আমি যাঁহাদের চিনি না, তাঁহারা আমার কথা শুনিতেছেন, তাঁহারা আমার পাশে বসিয়া আছেন, আমার মনের ভিতরে

চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহাদের ঘরকন্নার মধ্যে আমি আছি, তাঁহাদের কত শত সুখ দুঃখের মধ্যে আমি জড়িত হইয়া গেছি! ইঁহাদের মধ্যে কেহই কি আমাকে ভাল বাসেন নাই? কোন জননী কি তাঁহার স্নেহের শিশুকে স্তন-দান করিতে করিতে আমার লেখা পড়েন নাই, ও সেই সঙ্গে সেই অসীম স্নেহের কিছু ভাগ আমাকে দেন নাই? সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় আমার মমতা, আমার স্নেহ সহসা কি সান্ত্বনার মত কাহারো কাহারো প্রাণে গিয়া প্রবেশ করে নাই, ও সেই সময়ে কি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে দূর হইতে আমাকে বন্ধু বলিয়া তাঁহারা ডাকেন নাই? কেহ যেন না মনে করেন আমি গর্ব্ব করিতেছি। আমার যাহা বাসনা তাহাই ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। [মনে মনে মিলন হয় এমন লোক সচরাচর কই দেখিতে পাই? এই জন্য

মনের ভাবগুলিকে যথাসাধ্য সাজাইয়া চারিদিকে পাঠাইয়া দিতেছি যদি কাহারো ভাল লাগে! যাঁহারা আমার যথার্থ বন্ধু, আমার প্রাণের লোক, কেবলমাত্র দৈব বশতই যাঁহাদের সহিত আমার কোনকালে দেখা হয় নাই, তাঁহাদের সহিত যদি মিলন হয়! সেই সকল পরমাত্মীয়দিগকে উদ্দেশ করিয়া আমার এই প্রাণের ফুলগুলি উৎসর্গ করি।

আমি কল্পনা করিতেছি, পাঠকদের মধ্যে এই রূপ আমার কতকগুলি অপরিচিত বন্ধু আছেন, আমার হৃদয়ের ইতিহাস পড়িতে তাঁহাদের ভাল লাগিতেও পারে। তাঁহারা আমার লেখা লইয়া অকারণ তর্কবিতর্ক অনর্থক সমালোচনা করিবেন না, তাঁহারা কেবল আমাকে চিনিবেন ও পড়িবেন। যদি এ কল্পনা মিথ্যা হয় ত হোক, কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া আমার লেখা প্রকাশ

করি। নহিলে কেবলমাত্র শকুনী গৃধিনীদের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নির্ম্মমতার অনাবৃত শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে নিজের হৃদয়-খানা কে ফেলিয়া রাখিতে পারে?

আর, আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুইজনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীরস্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া! একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু

আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছুদিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক এক দিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।